শারদ সংখ্যা ১৪২৮

বই কুটির কলকাতা

ভূমিকা

সালটা ২০২০, মোটামুটি মার্চ এপ্রিল মাস, সারা পৃথিবী তখন করোনা নামক এক মহামারী রোগে জর্জরিত। এমনই সময়ে কলকাতার বুকে চারকোণে থাকা চারজন, যাদের মধ্যে হয়তো কেউ কারোর পূর্ব পরিচিত, যাদের প্রফেশনাল লাইফ সম্পূর্ণ আলাদা, তারা স্থির করল স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মানব জীবনের হাত থেকে মুক্তি দিতে কিছু একটা করতে হবে। পৃথিবীতে এমন অনেকেই রয়েছে যারা ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখে কিছু করে দেখানোর। এমনও অনেকে আছে যারা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারলেও লেখনির মাধ্যমে তা ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। এই ভাবনা থেকেই ঠিক হল সকলের কাছে পৌঁছতে হবে। পারিবারিক কিংবা সাংসারিক কারণে যেখানে কোনো গৃহবধূ ভুলতে বসেছিলেন তার লেখনী, বা অন্য কোন প্রফেশনে থাকায় লেখালেখির জন্য তেমন সময় হয়ে ওঠে না যাদের, হয়তো বা এমন কেউ যার লেখার কদর কেউ কোনওদিন করেনি আগে। সেইসব মানুষগুলোর শিল্পীসত্তাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ওই চারজনই প্রথম শুরু করল একটা ফেসবুক পেজ। যার নাম 'বই কুটির কলকাতা।' আস্তে আস্তে এরা মানুষের কাছে পৌঁছল। বলাবাহুল্য যে এখনও পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তারা হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কাছে আবেদন করতে থাকল তাদের শিল্পীসত্তাকে পুনঃরায় জাগ্রত করার জন্য । অভূতপূর্ব সাড়াও পাওয়া গেল। ফেসবুকে এই পেজে আস্তে আস্তে লেখা পোস্ট করা হল। প্রথম লেখা আসে একটা বিশেষ দিনে; সেই দিনটাকে 'বই কুটির কলকাতা'-র জন্মদিন মানা হয়। দিনটি হল ২০২০ সালের ১৫ ই আগস্ট। তারপর থেকে 'বই কুটির কলকাতা'য় মাঝে মাঝেই লেখা পোস্ট হতে থাকল। লেখক-লেখিকার সংখ্যা বাড়ল ; অনেক ধরনের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছোটগল্প ধীরে ধীরে জমতে শুরু করল। মাঝে অনেক বাধা-বিপত্তি এল কিন্তু তাও ছোট্ট ছোট্ট টলমল পায়ে নিজের তালে এগিয়ে যেতে লাগল। মাঝে কখনও কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিল নিজেকে। তারপর একদিন দেখা গেল গত এক বছরে ফেসবুক পেজে প্রায় ২০০ টা লেখা পোস্ট নিয়ে 'বই কুটির কলকাতা'র পেজটি সমৃদ্ধ হল। পাঠকের সংখ্যা নেহাত কম নয়-- প্রায় হাজার ছুঁইছুঁই- আর লেখক-লেখিকাঃ সেটাও প্রায় ৫০ জন।

এক বছর বয়স থেকে এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করল 'বই কুটির কলকাতা' আরেকটু যদি ভালোভাবে লোকের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। যদি আরও বেশি সংখ্যক লেখক ও পাঠকের সংস্পর্শে পৌঁছনো যায়। সেই ভাবনা থেকেই শুরু হল বই কুটিরের প্রথম ওয়েবসাইট যা আজ অর্থাৎ মহালয়ার দিন আত্মপ্রকাশ করছে। সেই সঙ্গে আজ প্রকাশিত হচ্ছে প্রায় ৩০টা লেখা ও কিছু ছবি। এ নিয়েই সংকলিত হয়েছে 'বই কুটির কলকাতা'র প্রথম শারদীয়া সংখ্যা। এটাই পথ চলার শুরু। পথ চলা এখনও অনেকটা বাকি; এই পথের মাঝখানে আসবে অনেক নতুন বাধা, অনেক বিপদ, অনেক চড়াই - উতরাই। কিন্তু ওই চারজন দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ - বড় করতে হবে '*বই কুটির কলকাতা* কে।

শারদীয়ার প্রথম সংখ্যায় হয়তো অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে। কিন্তু এরা যে এক বছরের মধ্যে এত বড় কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছে, এর জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আশা করব এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে দিয়ে আপনারা তাদের এই চেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করবে। আশা করব আপনাদের শুভকামনা বই কুটিরকে আরও বড় হতে সাহায্য করবে। আর আমি? কেউ না এই চারজনকে খুব কাছ থেকে দেখা একটা ব্যক্তি; যে দেখেছে কিভাবে পরিশ্রম করে এরা এক বছরের মধ্যে 'বই কুটির কলকাতা'কে এই জায়গায় দাঁড় করিয়েছে ও ওয়েবসাইট তৈরি করেছে। আপনাদের কাছে আমার একটাই আবেদন আসুন, বই পড়ুন। আপনাদের মতামত জানান এবং 'বই কুটির কলকাতা'কে আরও সমৃদ্ধ করুন আপনাদের লেখার মাধ্যমে। শুধু লেখক হলেই হবে না, পাঠকদের কাছে অনুরোধ আপনারা আপনাদের মতামত জানান। আপনাদের গল্প কবিতার অভিজ্ঞতা, অনুভব আমাদের কাছে এক অনুপ্রেরনা যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর বেশি কিছু বলব না, শুধু একটাই অনুরোধ 'বই কুটির কলকাতা'র লেখা পড়ুন এবং অন্যকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

***

সম্পাদকীয়

"যেখানেই দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।"

আমাদের গল্পটা অনেকটা এই রকম। সেই ছাই উড়াতে গিয়ে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের অমূল্য রতন, আমাদের স্বপ্নের জগৎ, যা ছিল বহু প্রতীক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত। একবারও ভাবতে পারিনি এইভাবে আমাদের স্বপ্নটা বাস্তবায়িত হবে। সারা পৃথিবী যখন ভুগছে নিদারুণ এক রোগে, চারিদিকে শুধুই দুঃসংবাদ, মনটাও ভালো নেই, জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এই মহামারীর জন্য, অফিস-কাছারি, স্কুল-কলেজ সবটাই বন্ধ, মানুষ ঘরবন্দি, আর প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছে দুঃসংবাদের ঠিক তারই মাঝে আমাদের জীবনে, হঠাৎ একটা স্বপ্ন উঁকি দিল। যেহেতু উত্তর কলকাতায় বসবাস, সেহেতু চা আর চায়ের দোকানের আড্ডাটা মিশে রয়েছে আমাদের রক্তে। কিন্তু এই মহামারীর জন্য সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। ভরসা বলতে শুধুই মুঠোফোনে হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক, অনলাইন কল এই করেই কাটছে জীবন। কিন্তু কথায় আছে না ‘দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে?’ হঠাৎ এক পড়ন্ত বিকেলে, তখন দিবানিদ্রায়, বাঙালির সাথে ছুটি আর ছুটির দিনে দিবানিদ্রাটাও আমাদের রন্ধ্রে। বেজে উঠল ফোনটা। ওপারের গলায় শোনা গেল, ‘শোন না হঠাৎ একটা জিনিস মাথায় এল। কাজ করবি?’ কাঁচা ঘুমটা ভাঙায় একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘ধুর এই সময় তার মধ্যে তুই আবার বলছিস কাজ করবি?’ উল্টোদিক থেকে রিপ্লাই এল, ‘বুঝতে পেরেছি তুই ঘুমাচ্ছিস। ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে ফোন করিস।’ খানিক বাদে ফোন করতেই হল শুরু। ফোনের ওপারে থাকা স্বরটি সীমন্তর। ফোনে বলেছিল, প্রথম কথা তুই লেখালেখি করতে ভালোবাসিস, তোর অনেক অপ্রকাশিত লেখা রয়ে গিয়েছে, এগুলো নিয়ে কিছু ভেবেছিস? ’ এরকম প্রশ্নে একটু বিব্রত হয়ে ছিলাম। তবে ফোনের ওপার থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এল কানে। বলেই ফেললাম, ‘তুই মাঝে মাঝে কি যে বলিস আমার কিছুই মাথায় ঢোকে না।’ সেই থেকে শুরু হল প্ল্যানিং। শোন একটা ফেসবুক পেজ বানাব, যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য। শুধু অপ্রকাশিত লেখাগুলিই প্রকাশিত হবে। আমিও একটা নতুন কাজ করার উদ্দীপনা পেলাম। তারপর একদিন দেখা করলাম দুই বন্ধু। আমি শুভজিৎ, পুরো নাম শুভজিৎ কুন্ডু।বসা হল সীমন্তর বাড়িতে।

দুজনে মিলে প্ল্যানিং করলাম আমরা এমন একটা মাধ্যম হব, যা যোগসূত্র তৈরি করবে লেখক আর পাঠকের মধ্যে। বহু মানুষ আছেন যারা খুব ভালো লেখেন কিন্তু তাদের লেখাগুলো অপ্রকাশিত থেকে যায় ব্যস্ততার জন্য কিংবা একসময় লিখতাম বহু লেখা জমে আছে এখন আর লেখা হয় না.. সেই রকম কিছু লেখক। আবার এমন কিছু মানুষ আছেন যারা পড়তে খুব পছন্দ করেন, কিন্তু সবসময় সম্ভব হয় না বই পড়া। তাছাড়া কোভিড আতঙ্কে বই প্রেমীদের সঙ্গে বইয়ের সম্পর্কে চির ধরেছে। তাই ডিজিটালি লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করতে উদ্যত হলাম । খুব ভালো লাগল। এত আনন্দে ছিলাম যে পুরনো লেখালেখিগুলো আবার ড্রয়ার থেকে বের করতে শুরু করলাম। সীমন্ত শুরু করল পেজ ডিজাইন করা। কিন্তু এই লেখাগুলো প্রুফ চেক করবে কে? কাউকে তো দরকার, নতুন লেখাও লাগবে। একটু চিন্তায় পড়লাম দুজনে।হঠাৎ সংকটমোচন।সীমন্ত পরিচয় করাল পল্লবীদির সাথে।পল্লবী সান্যাল, পেশায় সাংবাদিক। দারুন কর্মঠ, অসাধারণ প্রুফ চেক করে। কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত হলাম।যাত্রা শুরুর দিন ঠিক করলাম ১৫ই আগষ্ট ২০২০। সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল আমাদের স্বপ্নের জগত, "বই কুটির কলকাতা।"

নতুন লেখা, নতুন লেখনি, নতুন পাঠক। আমাদের কাছে স্বপ্নের মত লাগছিল। আস্তে আস্তে চাপ বাড়তে শুরু করল। আমরা কৃতজ্ঞ এত মানুষের সহযোগিতা, ভালবাসা পেয়ে। এত লেখক, এত পাঠকের যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আরও অনেক নতুন নতুন লেখকের লেখা আসতে শুরু করল। সবারই প্রায় ব্যস্ততার জীবন, কাজ ভাগ করেও কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না।ঠিক সেই সময় পরিচয় হল সুপর্ণার সাথে।সুপর্ণা দে, তরুণী সাংবাদিক। খুব পরিশ্রমী একটি মেয়ে, ওর কাছে ওর কাজটাই জীবন। আমাদের স্বপ্নের জগতের অনেকটা হাল ধরল সুপর্ণা।এমনও হয়েছে অফিসের কাজের মধ্যেও

আমাদের প্রুফ চেক করে দিয়েছে, ডিজাইন করে দিয়েছে। এমনও দিন গিয়েছে হঠাৎ একটা কিছুর প্রয়োজন পল্লবীদি ও সুপর্ণা কে বলেছি সঙ্গে সঙ্গে করে দিয়েছে। দুজন থেকে চারজন হলাম। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে পরিবার। বৃহত্তর হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের জগত,

"বই কুটির কলকাতা"

আরও নতুন লেখা, আরও নতুন লেখক, আরও নতুন পাঠক। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। সমৃদ্ধ হচ্ছি আমরাও। সাথে আমাদের স্বপ্নের জগত। দিন যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে "*বই কুটির কলকাতার*।"

যখন কিছু মাস বাদে একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে পৃথিবী, প্রথম পর্বের লকডাউন শেষে স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন, আবার কর্মমুখী হচ্ছে মানুষ, হঠাৎ একদিন এক বিশেষ কিছু সিদ্ধান্তের জন্য সকলেই একত্রিত হলাম ওয়েব মিটিংয়ে। আলোচনা থেকে উঠে এল "বই কুটির কলকাতা'র"একটা ওয়েবসাইট হলে কেমন হয়? 'যেহেতু সুপর্ণা এবং পল্লবী দি এইদিকে পারদর্শী তারা সবসময় উৎসাহ যুগিয়ে গেছে এটা করতেই হবে। কিন্তু এইটা করার জন্য তো একটা টেকনিক্যাল লোক দরকার। আমার আর সীমন্তর মুখে একটাই নাম, অরিত্রদা। এর থেকে ভাল লোক আর হয় না। অরিত্র সেনগুপ্ত, প্ল্যানিং হল দেখা করার। কিন্তু দেখা যে হবে তার জো আবার বন্ধ। এইতো দ্বিতীয় ঢেউ আবার গ্রাস করেছে জনজীবনকে তাই আবার দ্বিতীয় পর্বের লকডাউন। আলোচনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হলেও, ওই দু'জন কিন্তু আমাদের সর্বক্ষণ মনে করিয়ে গেছে আমাদের ওয়েবসাইটটা কি হল? আস্তে আস্তে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন। মিটিং হল, আমাদের সাথে যুক্ত হল অরিত্র দা। যেহেতু আমরা টেকনিক্যাল দিকে অতোটা পারদর্শী নই, তাই বাচ্ছাদের যেমন ভাবে বর্ণ পরিচয় করানো হয় ঠিক সেই ভাবে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করাল অরিত্র দা। এত সুন্দর ভাবে তৈরি হল আমাদের ওয়েবসাইটটা যা আমাদের কল্পনার অতীত।

অবশেষে আমাদের সাথে যুক্ত হলো আমারই সহপাঠী, বলা যেতে পারে আমার সুখ দুঃখের সাথি কুনাল। কুনাল দাস, যেহেতু ও মার্কেটিংয়ের আছে তাই তার থেকে আমাদের বই কুটির কলকাতার উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কেমন করে হবে তা ভার ও নিজে থেকেই কাধে তুলে নিলো, আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম।

আবার এক নতুন পথ চলা শুরু, ফেসবুক পেজ থেকে ওয়েবসাইট। আমাদের ট্যাগ লাইন টা সার্থক।

"আমরা সম্পর্ক তৈরি করি।"

মানুষের ভালবাসা পেয়েছি, তারা যখন ইনবক্সে রিপ্লাই করে, কেউ যখন আমাদের লেখা পাঠায় বা আমাদের পেজে গিয়ে লেখা পড়ে, কেউ যখন নিজের সাথে রিলেটেড করে সেই অভিজ্ঞতা আমাদেরকে শেয়ার করে, তখন মনে হয় আমাদের পরিশ্রম সার্থক। সকল গ্লানি, বহু না পাওয়া কিছু, ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এই ভাবেই আমাদের পথ চলা শুরু,দুই বন্ধুর আড্ডার ছলে বানানো একটা জগত আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে এতগুলো মানুষকে। এটা ভেবেই মনে আসে পরিতৃপ্তি। পথ চলতে শুরু করেছি, পেরিয়েছি একটা বছর, আজও অঙ্গীকারবদ্ধ বহুদিন একসাথে কাজ করব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। উপহার দেব বহু অপ্রকাশিত লেখা, লেখক ও পাঠকদের উদ্দেশ্যে। 'বই কুটির কলকাতা' তো সেতুবন্ধন পাঠকদের মধ্যে।

হয়তো সার্থক আমাদের ট্যাগ লাইন।

"আমরা সম্পর্ক তৈরি করি।"

***

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শিশু শিল্পী

প্রিয়াংসী সাহা

আরাত্রিকা মন্ডল

এবং

জুনালী বেজ (*প্রচ্ছদ*)

পৌলমী নিয়োগী

পারমিতা দত্ত

গার্গী ঘোষ

ব্রতশ্রী দাস

রোমিতা দাস

সূ চি প ত্র

ক বি তা

ভালো থেকো
বীণা পাল

শান্ত মেয়ে
দীপঙ্কর বিশ্বাস

শিউলির স্বপ্ন ভঙ্গ
মৌটুসী

নবপ্রেমজালে
সুনন্দ সান্যাল

আকাঙ্ক্ষা
অতীশ দীপঙ্কর

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীনি
মহঃ সামসুল হক

মোহ
রবীন মুখার্জি

শারদীয়া
নবীন মজুমদার

প্রযত্নে ডুয়ার্স
মনোজ পাইন

পাগল
জগন্নাথ মণ্ডল

এসেছে শরৎ
মঞ্জু ভট্টাচার্য

সূ চি প ত্র

ছো টো গ ল্প

ফিরে দেখা
সুতপা হালদার

ভারতীয় হস্তিনীর আমেরিকা জয়
সুনন্দ সান্যাল

বাঁচতে ভালো লাগে না
বীণা সেনগুপ্ত

উপলব্ধি
অভিজিত বাকুলি

বকুক

বই কুটির
কলকাতা

শারদ সংখ্যা
১৪২৮

সূ চি প ত্র

গ ল্প

রুদ্রর মেমসাহেব
বীরেন ভট্টাচার্য

ফিনফিনে শাড়ি, বৃষ্টি আর অনন্ত দীর্ঘশ্বাস...
দিব্যেন্দু ঘোষ

আমি তখনও ...
অজ্ঞাত গোলপ

তৃষিত মন
অজন্তাপ্রবাহিতা

পজেটিভ
-অগ্নিমিতা দাস

পাশ্চাত্যের সামাজিকতা বর্জন করতে হবে
মহঃ সামসুল হক

দেবীদর্শন
শোভন সুন্দর দাস

মাতলা
দেবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

বিপদ
কমলকুমার ঘোষ

প্রসন্নতা
সুনীতি মণ্ডল

ঠাকুর দেখা মানেই ১১ নং
পল্লবী সান্যাল

মেলার প্রাপ্তি
সুস্মিতা সাহা

তৃণা
গোপা দাস

বিজয়ধনুশ
অয়ন দাস

চিত্র শিল্পীঃ **ব্রতশ্রী দাস**

ভালো থেকো

বীণা পাল

আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি উঠোন,
মায়ের কোলের মৃত সন্তান, অমৃতের ছোঁয়ায় হেসে উঠুক।
ভেসে যাক সব হতাশা, সূর্য কিরণে উজ্জ্বল হোক কলুষিত মন,
বাচ্ছা মেয়েগুলো ভিড় রাস্তায় দৌড়ে বাড়ি ফিরুক।
মুখের মাস্ক আর মুখোশ ছুঁড়ে ফেলি ঘামের লোনা সাগরে।
যে পথ একা একা হারিয়ে গেছে অন্য পথে,
সেই পথে সবাই মিলে পথ হারাতে চাই।
পৃথিবী.... তোমার ভাবনা আমাদের দাও,
আমরা ভিসুভিয়াসের লাভার জমিতে নতুন ফসল ফলাব।
মাঝি সাঁঝের বেলায় ভাটিয়ালি গানে,
বৈঠা হাতে পূর্বের আকাশে পদ্ম দেখবে।
কোন এক নববধূ এইমাত্র মঙ্গল ধ্বনিতে বাতাসে ধূপের গন্ধ ছাড়বে।
আজানের সুর আশ্বাস দিবে নতুন দিনের,
আবার আমরা এক হব, বনভোজনের আয়োজনের অবসরে বলব,
ভালো আছি আমি, তোমরাও ভাল থাকো।

***

বকুক

শান্ত মেয়ে

দীপঙ্কর বিশ্বাস

মেয়েটি আস্তে আস্তে চোখ খোলার চেষ্টা করছে,

চারিদিকে তার ভীষণ শীতলতা!

তবে কি এখনও তুষার যুগ চলছে?

তার সাদা মনের পৃষ্ঠাগুলো এখনও ভীষণ সাদা!

তাও আছোলা বাঁশ কে যেন ঘরে সাজিয়ে রেখেছে!

তার সবই ভীষণ সাদা; ফুলদানীতেও সব সাদা ফুল!

তবে কি সে আর বেঁচে নেই?

তাও বারবার উঠে বসার চেষ্টা করলে, ভীষণ মাথা ঘোরে!

শরীরেও তীব্র যন্ত্রণা !

চোখের পাতা ভারি হয়ে ওঠে!

মস্তিষ্কের ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়!

সে কবিতা লিখেতে চায়,

"নারীরাই নারীদের শত্রু"।

ভাবনাগুলো কেমন যেন!

হৃৎপিন্ড হিম হয়ে যায়!

মেয়েটি জানে সব "অঙ্গীকার আর শপথ"

সেও শুনেছে-

"অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়"!

তার রক্তে নেই কোন সাদা বরফকুচি,

তাও ঋতুস্রাবে ডুবে যায় গাঢ় অন্ধকারে!

মেঘেরা নেমে এলে

শিরা উপশিরা ধমনী বেয়ে কনকনে শীত বয়ে যায়!

আগুনের ফুলকি ওঠে পাড়ায় পাড়ায়,

মেয়েটি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে

বাঁশপাতা থেকে ঝুরো বরফ তারদিকে ধেয়ে আসে!

***

শিউলির স্বপ্ন ভঙ্গ

মৌটুসী

অনেক রাত জেগে আছে শিউলি

শিশির আসবে কথা দিয়েছিল।

আকাশে মিষ্টি রোদে শরতের ছোঁয়া -

কিন্তু না। শিশিরের বুকে ভয়ের পাথর।

শিশির এড়িয়ে যাচ্ছে রোজ ,

অবহেলায় শিউলির রং ম্লান হয়ে আসছে -

শিউলির স্বপ্নের রং কালো মেঘে ঢেকে দিচ্ছে।

প্রতি রাতে অপেক্ষা করলেও শিশির আসে না,

পাঁপড়িগুলো শুকনো , তৃষ্ণার জল টুকু নেই।

শিশির কি পারবে শিউলির স্বপ্নকে বাঁচাতে?

মহাকাল এর উত্তর দেবে।।

***

নবপ্রেমজালে

সুনন্দ সান্যাল

গোধূলির কফি কাপের উষ্ণতায়

সব চুপকথার আলেখ্য হওয়ার স্বীকৃতি..

ইতিউতি পড়ে থাকা আলাপ, বন্দিশের মিলমিশে

শুষ্ক কঠিন শহরে জন্মগ্রহণ, ভালোবাসার অনুভূতি।

নতুন শর্তে, নিয়মিত অভ্যাসে ভাব জমানো স্পর্শ

অভিমানী বিনিদ্র রাত স্বপ্ন পুষেছে একমুঠো..

আয়নার আড়ালে ভেজা মাটি, পুরোনো বর্ষণ

আনকোরা প্রথার পকেট ভর্তি আবেগের খরকুটো।

সাদা কাগজে শব্দের অবিরত আপোষময় আঁচড়

একগুঁয়ে ভাবনায় তুমি ফিরবে পড়ন্ত দিনের উপন্যাসে..

উন্মত্তের মতো আঁকড়ে চলে প্রেমিকের সংবিধান

এনক্রিপশন কোড ভাঙার চেষ্টা সিপিয়া টোনের আকাশে।

***

আকাঙ্ক্ষা

অতীশ দীপঙ্কর

খচ্চরের পিঠে বসা মানুষেরা ভীষণ খচ্চর!

ভালোবাসা আর ভাল লাগাকে ভেবেছে খেলার!

একটু বেশি বড় আমার মাঠের চারিধার

তাই ছুটতে ছুটতে হাঁফিয়ে ওঠে প্রাণাধার!

খুব বোকামিতে আটকে থাকি,

সব সময় সরল-সোজা ছবি আঁকি।

মন গেঁথে গেঁথে আছে আকাশের ভিড়ে,

সরল-রেখা চারপাশে জাঁকিয়ে বসেছে।

সেই কবে পান্তা খেয়েছিলাম বাসি মুখে,

আজও মনে পড়ে!

আজও ঘাটে নামি সেই সিঁড়িটি বেয়ে,

এবার আবার বৃষ্টিতে কদম ফুটেছে গাছটিতে।

গন্ধ বিকেলের পড়ন্ত বেলায়ও থাকলাম অঁজ গাঁয়ে,

রোদেলা বাতাস খেলে যায় আমার জানালার ধারে।

বসে থাকি বা উপুর হয়ে শুয়ে থাকি----

বৃষ্টি নামে সন্ধ্যায় গাছের অন্তপুরে জানি।

তাও অপেক্ষার রাত্রি জাগরণ ঘুমহীন,

ভোরের ক্লান্তির অক্লান্ত শরীরে যদি বৃষ্টি ভেজায় মন।

***

বকুক

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীনি

মহঃ সামসুল হক

খুঁজি কত কাল আকাশ পাতাল,
খুঁজে পাইনি তো আমি।
ব্যস্ততা কাজে রিংটোন বাজে,
ফোনটা করেছিলে তুমি।।
রিসিভার তুলি যেই কথা বলি,
মিলে যায় অনুভূতি।
চরিত্র বান সতীত্বের প্রাণ,
কথার চাইলে অনুমতি।।
প্রশ্ন করোনি আমি কোন জাতি,
গল্প করিলে ক্ষনে কাল।
মানুষ যে আমি তাই কথা বলি,
সময় টা ছিল কুড়ি সাল।।
প্রয়োজন নয় প্রিয়জন তুমি,
পারি না থাকতে সরে।
আমার রক্তে তোমারই সৃষ্টি,
থাকিতে পারি না তাই দূরে।।
যত বলি ফোনে জানি ক্ষণে ক্ষণে ,
অতীত জীবনের কথা।
চির সঙ্গীনি নয়নের মণি,
মিশে যায় দুই মাথা।।
সততা দেখে মুগ্ধ হয়েছি,
তাই তো করিনি দেরি।
অসৎকে আমি, ঘৃণা ভরে দেখি,
যদিও হয় সে পরী।।
প্রমান পেয়েছি নত মস্তকে,
শুনেছো আমার বাণী।
তুমিই আমার সঙ্গীনি হলে,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী।।
প্রতিদিন ফোনে বলো কানে কানে,
খাবার সময় হলে।
রাতের খাবার খাওয়া হলে মোর,
তার পর তুমি খেলে।।
জীবন আমার ধন্য হয়েছে,
পেয়েছি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীনি।
দুইটি হৃদয় এক হয়ে গেছে,
তুমিই নয়নের মণি।।

***

বকুক

মোহ

রবীন মুখার্জি

আমরা সবাই মানুষ হয়ে করছি পৃথিবী রাজ
মুখে সাধু কথা বলি, আসলে ধান্দাবাজ
জীবনের মূল লক্ষ্য একটাই, অর্থ ভোগবিলাস
এটাই সুখের চাবিকাঠি , এই মোদের বিশ্বাস।

আনন্দ আর স্ফূর্তি মানে জমিয়ে মদের পার্টি
এই কালচারে চরিত্রকে করব গড়ে খাঁটি
ঘুষ নেওয়াটা এই সমাজে নয় কো অপরাধ
চুরির দায়ে পড়লে ধরা, বলে কেয়াবাত কেয়াবাত।

ন্যায়ের পথে চলতে গেলে আসবে অনেক বাধা
নিজের লোকেই বলবে তোমায় আস্ত একটা গাধা।
ন্যায় মানে তো বোকামি আর মূল্যবোধের কথা
যার নেই আজ কোন অর্থ, কেবল পুথিতে আছে গাথা।

ভোগবিলাসের জীবনযাপনে , মূল মন্ত্রই অর্থ
কিন্তু বইয়ের পাতায় লেখা আছে , অনর্থের মূল অর্থ।
অর্থ থাকলে তুমি পাবে এই সমাজে মান
এলিট স্কুলে পড়বে ছেলে দিয়ে ডোনেশন।

তাই তো আজকে নিয়মনীতি দিয়ে গঙ্গা জলে
অর্থ কামাই মূল লক্ষ্য ছলে ও কৌশলে।
অর্থ দিয়ে কিনব সুখ আর করব বিশ্ব জয়
কিন্তু সময় নেই কো ভাবার, তাই কখনও হয়?
অর্থ জীবনে দেয় সামগ্রী, দেয় না মনের সুখ
তাই, চাই অর্থ সদাই বলে, এনো না মনের অসুখ।

***

শারদীয়া

নবীন মজুমদার

থাকব না কি বদ্ধ ঘরে
কোভিড কালের অন্ধকারে
শিউলি ডাকে আপন প্রানে
কাশবনের ওই মেঠো খানে।
আকাশ বলে শরত আসে
পুজোর গন্ধ সকল খানে
হিমেল হাওয়া এসে বলে
মায়ের পুজো এসে গেছে।
সকল শিশুর প্রাণে দোলে
অনাবিলের আনন্দ যে
দুর্গা আসে, দুর্গা আসে
মনটা সবার ভরিয়ে তোলে।
দুর্গা আসবে বারে বারে
কোভিড তুমি হারিয়ে যাবে
শ্বাস-প্রাণের বাধা দিয়ে
মুখ বন্ধ করেছিলে।
প্রাণের পুজো দুর্গাপুজো
ভার্চুয়ালি দেখিয়েছিলে
আপন প্রাণের সম্পর্কগুলো
সামাজিক দূরত্বে ভেঙেছিলে।
অবাক করা স্পর্ধা তোমার
ধ্বংস লীলায় মেতেছিলে
এবার তোমার থামতেই হবে
মা দুর্গা যে এসে গেছে।
হিমেল বাতাস নীল আকাশে
শান্ত তোমার হতেই হবে
শিউলি ফুলের গন্ধ যেন
শারদীয়ার ডাক দিয়েছে।
থাকব না তা বদ্ধ ঘরে
অনাবিলের আনন্দতে।।

***

প্রযত্নে ডুয়ার্স

মনোজ পাইন

তোমার যখন খুব মন খারাপ
কিচ্ছুটি লাগছে না ভালো,
মনে হচ্ছে পৃথীবিটা একবারে বোগাস!
ইচ্ছে হয়
দু'চোখ যেদিকে যায় চলে যাওয়ার
ঠিক তখনি
এই মায়া ভূমিতে এসো।
ঠিকানাটা লিখে নাও
মায়াভূমি-প্রযত্নে ডুয়ার্স।

নিঃসঙ্কোচে, নির্বিবাদী হৃদয়ে বলছি-
এ অরণ্যভূমি অবুঝ,

সবুজ হৃদয় ছাড়া বোঝে না।

প্রতিটি ভোরে শিশির সিক্ত বনপথে

যখন তুমি হেঁটে বেড়াবে

অনুভব করবে হাজার হাজার কুঁড়ি

ফুল হয়ে ফোঁটার সাথে সাথে

তোমার হৃদয়ও ফুলে ফুলে ভরে উঠছে!

হৃদয় ভালোবাসার কুসুমে ভরে উঠলে

পৃথিবীতে কোন পাপ আর পাপ থাকে না।

তখনি আমাদের অহেতুক ঘৃণা সকল সরিয়ে

উড়ে যাবে কোন একটি ধনেশ পাখি!

তোমাকে তো শেখাতে হবে না কিছুই

তুমি ভোরের আঁচল খুলে

কুড়িয়ে নেবে বসন্তের ফুল,

তারপর সেই পথে দাঁড়াবে

যে পথ গিয়েছে বেহেশতের দিকে!

জানি তুমি বেহেশত চাও না।

বরং অনন্ত প্রতিক্ষায় জেগে থাকবে

কখন কিছু জ্বালানীর কাঠ সংগ্রহ করে

ফিরে আসবেন তোমার হৃদয়ের ফেরেস্তা!

তুমি জোৎস্নায় অবগাহন সেরে রাঁধবে পঞ্চব্যঞ্জন!

ঠিক তখনি সিদ্ধার্থ আবারও তপস্যায় বসবেন।

***

পাগল

জগন্নাথ মণ্ডল

রাস্তায় দৌড়ে বেড়ায় ছেলেটা।

কখনও বিড় বিড় করে মুখে।

কখনও আবোল তাবোল কথা - কখনো
এমন ভাব যেন আছে সুখে।

কি ভাবে হোল পাগল সে কেউ কি জানে
তা - এখানে ওখানে সবাই দেখে কিন্তু খবর
রাখে না।

ওরও নেই মনে আজ সে সব দিন।
অত্যাচারে অবিচারে হয়েছে গৃহহীন।

সভ্যতার এই চরম সীমায় ঘুরে ফেরে
পাগল। পুলিশ প্রশাসক সবই জানে নেইনা
সেথা দখল।

জানতে গেলে দেখা যাবে দায়ী নিজেরায়।
সুস্থ জীবনে পাগল কে ফেরানো ওদের
কর্ম নয়।

আইনের আশ্রয় পায়না বলেই এসব মানুষ
পাগল। কেটে গেছে যুগ এখনও মানুষ
এদের সুস্থ করতে অসফল। হিংস্র পশুর
জন্য - রয়েছে অভয়ারণ্য। পাগল যখন
সমাজ বানিয়েছে তবে এখনও কেন ওরা
বন্য?

***

এসেছে শরৎ

মঞ্জু ভট্টাচার্য

ঢাক বাজে, বাদ্যি বাজে
মনের ভিতর,
শিউলি ফুলে আঙিনা সাজে,
করিয়া যতন।
মাঠঘাট গেছে ভরে,
সাদা কাশ ফুলে -
শরতের স্নিগ্ধ হাওয়ায়,
ওঠে হেলে দুলে।
সুনীল আকাশে ভাসে -
তুলো তুলো মেঘ,
তাই দেখে বঙ্গবাসীর
উদ্বেলিত আবেগ।
ছন্দে নাচে নদীর ঢেউ,
আগমনীর সুরে,
মা দুর্গা ঐ আসছেন,
খুশির ভেলায় চড়ে।

***

শিশু শিল্পীঃ **প্রিয়াংসী সাহা**

ফিরে দেখা

সুতপা হালদার

ব্যালকনিতে দু কাপ চা নিয়ে দাঁড়িয়ে সুজয় আর মেঘমালা.,,একে অপরের দিকে সুমলিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে,, আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টির ছোটো ছোটো বিন্দুগুলো যেন আলতোভাবে স্পর্শ করেছে দুটো হৃদয় কে,,করবি গাছের ফুলগুলোও যেন মুক্তোর মতো ফুটে উঠেছে। আসলে সাংসারিক চাপ কিংবা অফিসের চাপ ,, দুজনেই সারাদিন অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেই দিন অতিবাহিত করে,, একে অপরের সাথে আগের মতো গুছিয়ে গল্প করাও ঠিক হয়ে ওঠেনা ওদের।

বর্ষার প্রথম বৃষ্টি যেন ওদের কিছুটা সময় করে দিল, অনেক জমে থাকা আবেগের স্মৃতিচারণ করবার জন্য।

সুজয় - কি অসাধারণ রূপ এই প্রকৃতির তাই না, মেঘ !!!

মেঘমালা - হুম !! কতো স্নিগ্ধ, কতো প্রাণোচ্ছল !! করবি ফুলগুলো দেখছো!! যেন বৃষ্টির স্পর্শ পাবার জন্যই ওরা ফুটে উঠেছে তাই না !!

সুজয় - হুম, একদমই তাই...।

উপরের ব্যালকনি থেকেই হঠাৎ চোখ যায় নিচের রাস্তার দিকে,, থমকে যায় ওদের দুজনের দৃষ্টিই...ঠিক যেন বারো বছর আগের সমস্ত স্মৃতি যেন একঝলকে ডানা মেলে ভেসে ওঠে ওদের চারপাশে। ঠিক যেন সেই সুজয় আর মেঘমালা... একজনের হাতের উপর আরেক জনের বিশ্বাস - ভালোবাসা পূর্ণ হাত আর একে অপরের দিকর এক বিস্ময়কর দৃষ্টি, বৃষ্টির সাথে একটা দমকা বাতাস মনে করিয়ে দিল, যে, সময় ছিল ওদেরও...।

দুজনের অজান্তেই সুজয়ের হাত কবিতার কাঁধে স্পর্শ করল, আর মেঘমালার মাথাও স্পর্শ করল সুজয়ের কাঁধ। দুজনের চোখের কোন থেকেই যেন তখন অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে এল...

মেঘমালা বরাবরই কবিতা অত্যন্ত ভালোবাসে,,সুজয়ের কাঁধে মাথা রেখে সে বলে উঠল...

"পরের জন্মে বয়স যখন ষোলোই সঠিক আমরা তখন প্রেমে পড়ব মনে থাকবে?
বুকের মধ্যে মস্তো বড় ছাদ থাকবে শীতলপাটি বিছিয়ে দেব;
সন্ধে হলে বসব দুজন।
একটা দুটো খসবে তারা
হঠাৎ তোমার চোখের পাতায় তারার চোখের জল গড়াবে,
কান্ত কবির গান গাইবে
তখন আমি চুপটি করে দুচোখ ভরে থাকবো চেয়ে...
মনে থাকবে?"

ভেজা বাতাস আর করবীর গন্ধে মিলেমিশে আবার একাকার হয়ে উঠল সুজয় আর তার প্রাণের মেঘ...।

***

ভারতীয় হস্তিনীর আমেরিকা জয়

সুনন্দ সান্যাল

৩রা ডিসেম্বর ১৭৯৫, মঙ্গলবার, কলকাতা পোর্ট (খিদিরপুর পোর্ট) থেকে "The Ship America" নামক বিশালকায় জাহাজের মধ্যে ২৩ বস্তা চা ও কফি, বড় বড় গোটা কুমড়ো ৬০-৬৫টা, গোটা বাঁধাকপি ৩০-৩৫টা, লাল শাক, পালং শাক, সজনে ডাঁটা পাকাকলা এবং কাঁচকলা ভর্তি বড় বড় বস্তা তুলে রাখা হয়। এরপরে সেই জাহাজের মালিক ও ক্যাপ্টেন জ্যাকব ক্রাউনশিল্ড দু বছর বয়সের একটি হস্তিনী জাহাজের মধ্যে তুলে দিয়েছিলেন, তিনি জাহাজের নথি বইতে বড় বড় করে ইংরাজী ক্যাপিটাল হরফে লিখেছিলেন "Elephant On Board." বিকেল ৪টেয়, জাহাজ কলকাতা পোর্ট ছেড়ে দিয়ে রওনা দেয় আমেরিকার উদ্দেশ্যে। ১৩ই এপ্রিল ১৭৯৬ বুধবার, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক পোর্টে জাহাজ পৌঁছে যায় এবং বাংলার দুই বছরের সুস্হ সবল হস্তিনী পা রাখে আমেরিকার মাটিতে।

' Ascension' দ্বীপের দিকে জাহাজ যতো এগিয়ে চলেছে ততো ক্যাপ্টেন জ্যাকবের চিন্তাভাবনায় প্রকট হয়েছিল যে এতটা জলপথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জাহাজ যে পড়বে এটা নিশ্চিত এবং সেই কারণে যদি হস্তিনীর কোন ক্ষতি হয় তাহলে নিজেকে একজন পশুপ্রেমী হিসাবে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারবে না জ্যাকব। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সমগ্র সমুদ্রযাত্রা অতি শান্ত ছিল, এমনকি যে জাহাজের লগবুক আমেরিকা থেকে কলকাতা আসার সময় ৫টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নথিভুক্ত করেছিল, সেই জাহাজ কলকাতা থেকে আমেরিকা যেতে একটিও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়নি।

সমগ্র আমেরিকা জুড়ে মানুষের মধ্যে কৌতূহলের উদ্রেক হল, আমেরিকার প্রথম হাতি, ক্যাপ্টেন জ্যাকব নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন হাতিটিকে এবং সেবা করা শুরু করলেন। কলকাতা থেকে এসে আমেরিকার জলবায়ুর সঙ্গে হাতিটা যেন মানিয়ে নিতে পারে তাই জ্যাকব আমেরিকায় দক্ষিণপ্রান্তে 'Saint Helena' তে নিয়ে যান যেখানে প্রচুর গাছপালা ও অফুরন্ত জল আছে। ১৩ই এপ্রিল থেকে হাতিটিকে কেন্দ্র করে জ্যাকবের কাছে প্রচুর নানাবিধ প্রস্তাব আসতে শুরু করে এবং স্হানীয় মানুষরা দাবি করেন যে এই হাতির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে সমগ্র আমেরিকা জুড়ে। প্রদর্শনীর প্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় 'আরগাস' এবং 'গ্রিন লিফ' পত্রিকায় ২৩শে এপ্রিল ১৭৯৬, জ্যাকব সিদ্ধান্ত নেয় মে মাসের ১৩ তারিখ থেকে প্রদর্শনী শুরু করবেন, কিন্তু ৪৫০ ডলারের বিনিময়ে কেনা হস্তিনীর শরীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে সে কোনওরকম আপোষ করবে না।

প্রথম প্রদর্শনীতে নিউইয়র্কের বিভার স্ট্রিট, ব্রডওয়েতে বিশাল সংখ্যায় জনসাধারণের ভীড় হয়েছিল, এতো মানুষের ভীড় দেখে হাতি যে ভয় পেয়েছিল, আতঙ্কিত হয়েছিল সেটা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জ্যাকব, তাই প্রথম প্রদর্শনীতে পাঁচ হাজার ডলার

বকুক বকুক বকুক

উপার্জন হলেও ওই বছরে আর একটিও প্রদর্শনী করেননি। ক্রমাগত প্রদর্শনীর প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও জ্যাকব কোনও গুরুত্ব দেয়নি। জ্যাকব আমেরিকার সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন হাতির শরীর স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপোষ করে প্রদর্শনী করবেন না। এরপরে হাতিটির ওপরে এবং জ্যাকবের ওপরে পরপর দুইবার প্রাণঘাতী হামলা হয়, প্রতিবেশীদের সাহায্যে কোনওরকমে নিজে প্রাণে বাঁচেন জ্যাকব এবং বাঁচিয়েছিলেন প্রিয় হাতিটিকে।

১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ও অক্টোবর মাসে আবার প্রদর্শনী করেন জ্যাকব কিন্তু এবার দর্শকসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে। এরপরেই জ্যাকবের শরীর হঠাৎ খারাপ হতে থাকে, চিকিৎসক আর্নল্ড ব্যাপিস জানায় যে তার আয়ু আর বেশিদিন নয়। জ্যাকব বাধ্য হয়ে হাতিটির দায়িত্বভার তুলে দেয় বিখ্যাত 'Barnum & Bailey' সার্কাসের মালিক ও পশু চিকিৎসক হাচালিয়াহ বেইলির হাতে। বেইলি হাতিটির নামকরণ করেন 'ওল্ড বেট। বেইলির সার্কাসে এতদিন ছিল প্রশিক্ষিত বন্য কুকুর, শূকর এবং ঘোড়া। প্রশিক্ষিত হওয়ার পরে ১৮০৪ সালে হাতি ওল্ড বেট, বেইলি সার্কাসের মূল আকর্ষণ হয়ে যায় এবং বেইলি সার্কাস বিপুল অর্থে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

বোস্টন হেরাল্ডস (Special Article, The Elephant, 1895 Print) ও নিউ ইয়র্ক টাইমসে (The Elephant Old Bet, 1895 Print) প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ১৮১৬ সালের আগস্ট মাসে নর্থ ক্যারোলিনাতে কয়েকজন যুবক ওল্ড বেট হাতিটার গায়ের চামড়া দেখে বাজি ধরেছিল যে এই চামড়া বুলেটপ্রুফ। হাতির গায়ের চামড়া সত্যি বুলেটপ্রুফ কি না সেটা প্রমাণ করতে গোপনে শব্দহীন বন্দুকের ব্যবহার করে হাতিটাকে নির্বিচারে গুলিবিদ্ধ করা হয়, ওল্ড বেট মৃত্যুবরণ করে। ১৮২১-এ বেইলি ওল্ড বেট হাতির স্মরণে নিউ ইয়র্ক সোমার্সে 'The Elephant Hotel' নির্মাণ করেছিলেন এবং হোটেলের সামনে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। যে হোটেল ও স্মৃতিসৌধ আজও উজ্জ্বলভাবে ১৭৯৬ সালের সেই দুই বছরের কলকাতা তথা ভারতীয় হস্তিনীর ইতিহাস বহন করছে।

***

শিশু শিল্পীঃ **আরাত্রিকা মন্ডল**

বাঁচতে ভালো লাগে না

বীণা সেনগুপ্ত

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় পথের ধারে দেখলাম লোকটাকে। পরনে আধ ময়লা কাপড় হাঁটুর উপরে। গায়ে ছেঁড়া জামা। এক মুখ পাকা দাড়ি। মাথায় গামছা। একহাতে তোবড়ানো পুরনো সিলভারের বাটি। অন্য হাতে লাঠি। চেহারা খুবই রোগা। ওর অবস্থা দেখে দুঃখ হল। ওকে কিছু পয়সা দিই। খুব খুশি হয়। একদিন বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম বাইরে চিৎকার করছে। 'মা কিছু দয়া কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' জানলার কাছে গিয়ে দেখলাম সেই লোকটা। ভিক্ষে করতে এসেছে। আমি তক্ষুণি নিজের জমানো একটা টাকা নিয়ে নিচে নেমে গিয়ে তার হাতে দিলাম। সে অবাক। ফেল ফেল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললাম, 'ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' সে বলল, 'এর আগে কোনদিন একজনের কাছে এক সাথে এক টাকা পাইনি। সবাই ভাগিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ যা খুশি তাই দিয়েছে।' ওর সব খবর জানতে ইচ্ছে হল। লোকটা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলে,'আমার নাম কালু। বাড়ি ছিল মেদিনীপুরে জেলার একটা ছোট্ট গাঁয়ে। গাঁয়ে লোকজন বড় কম। আমি একটু আধটু লেখাপড়া শিখেছিলাম। কলকাতার এক কারখানায় কুলির কাজ করতাম আর সেখানেই থাকতুম। মাঝে মাঝে দেশে পাঠাতুম টাকা। কপাল, মা, সব কপাল। একদিন খবর পেলুম সর্বনেশে কলেরা বাড়ির সবাইকে নিয়ে চলে গেছে দুনিয়া থেকে। কালুর গলা ধরে এসেছিল। এরপর শোকে ও দুঃখে কালুর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে আর নিয়মিত কাজে যেত না। চাকরি চলে গেল। দিনে দিনে শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। তারপর ভিক্ষের ভরসায় দিন কাটছে কালুর।

তার গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক পড়ল। কালু চলে গেল। আমিও চলে গেলাম। মাকে কালুর সব কথা বললাম। মা বললেন, 'আহা বেচারা। মানুষের ভাগ্যে কখন যে কি হয় বলা যায় না।' তারপর তিনচারদিন রোজই ওই সময় আমাদের বাড়ি এসে চিৎকার করত 'দিদিমণি।' আমি দরজা খুলে দিতাম এবং মা তাকে কলাপাতায় যেদিন থাকত তাই দিত। যাবার সময় তৃপ্ত হয়ে হাসিমুখে 'জয় হোক' বলে চলে যেত। কদিনেই কালুর ওপর মায়া পরে গেল আমাদের। একদিন কালুর আশায় বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। সে আর এল না। বিকেলবেলা আমি বন্ধুদের সঙ্গে রেল মাঠে বেড়াতে গিয়ে দেখি লাইনের ওপর ভিড় হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখার ইচ্ছে হল। ভিক্ষে গিয়ে যা দেখলাম ভিড় ঠেলে গিয়ে যা দেখলাম, যে লোকটা কাটা পড়েছে সে আর কেউ নয়- আমাদের কালু। মনটা বেদনায় ভরে উঠল। বন্ধুদের সঙ্গে না গিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। মাকে বললাম। মা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুই অন্য কাউকে দেখেছিস।' বললাম, 'না মা, ও কালুই। মা কিছুক্ষন কী যেন ভাবল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। দেখলাম মার চোখে জল। রান্না ঘরে চলে গেল মা। কালুর একটা কথা মনে পড়তে লাগল। সে মাঝে মাঝে বলতো, '**দিদিমণি আর বাঁচতে ভালো লাগে না**।' আজও মাঝে মাঝে কালুরর পাকা দাড়ি ভরা মুখটা দেখতে পাই মনের মধ্যে। কালু লাঠিতে ভর দিয়ে তোবড়ানো বাটি হাতে এগিয়ে চলেছে মনের পর্দায় - স্পষ্ট দেখি আজও।

***

উপলব্ধি

অভিজিত বাকুলি

আজ কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে এসে আদিত্যবাবু জীবনের অনেক পাওয়া না পাওয়ার হিসাব কষতে বসেছেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর ছেলেবেলার কত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যা চাইলেও আর কখনও পূরণ করতে পারবেন না তিনি। তৎক্ষণাৎ হাসি পেল, তাঁর মন সগর্বে যেন ঘোষণা করতে চাইল, এই না পাওয়া টাই কি সব? তিনি তো তাঁর একমাত্র ছেলেকে প্রাপ্তির স্বর্গে বিচরণ করিয়েছেন, আজ তারই ফলস্বরূপ আলাদা ফ্ল্যাট, প্রয়োজন ছাড়া এ বাড়িতে ছেলের আগমন খুব একটা হয় না। স্থানাভাব... তা কিন্তু নয়, হয়তো মানসিক স্থানটা সংকীর্ণ। তাই তাঁর ছেলে স্ত্রী ও সন্তানের সাথে আলাদা বাড়িতে থাকেন।

এই সাত -পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে একটা অনাবিল পরিতৃপ্তি অনুভব করেন আদিত্যবাবু। কারণ তাঁর বৃদ্ধ বাবা- মা তো তাঁর সাথেই থাকেন। আদিত্য বাবুর কাছে এটা কি কম প্রাপ্তি? নামী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পদ থেকে কর্মজীবন সমাপ্তির পূর্ব লগ্নে তাঁর উপলব্ধি হয় শুধুমাত্র পাওয়াটাই জীবনের সবকিছু নয়, না পাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রাপ্তির আনন্দ।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার সেই মর্মবাণী তাঁর কানে যেন ধ্বনিত হয়- পরিবারের স্নেহ, কবচ রূপে থাকলে যথার্থ, কিন্তু তা অতিরিক্ত হলে অস্ত্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ সন্তানদেরকে আমরা সুখে রাখতে গিয়ে তার সমস্ত চাওয়া পূরণ করার চেষ্টা করি, কিন্তু এতে তাদের কতটুকু উন্নতি হচ্ছে বা কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে ভেবে দেখিনা।

তাই কর্মজীবনের শেষে আদিত্যবাবুর এই উপলব্ধিকে সংকল্পে পরিণত করতে পথশিশুদের মানসিক ও দৈহিক বিকাশের জন্য তিনি একটা সান্ধ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সকল মানুষের হৃদয় আদিত্য বাবুর ন্যায় উন্মুক্ত হোক ও উপলব্ধির সূর্য যেন সংকীর্ণ আমিত্বের মেঘকে কাটিয়ে দৃঢ়তার রৌদ্রোজ্জ্বল , মেঘমুক্ত আকাশ উপহার দিতে পারে অন্তর্যামী র নিকট সকলের এই প্রার্থনা।

***

বকুক বকুক বকুক

রুদ্রর মেমসাহেব

বীরেন ভট্টাচার্য

বহু দিন পর দিল্লির অভিজাত ফ্ল্যাটে একাকী সময়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্মৃতির স্মরণীতে ডুব দিল রুদ্রনীল ব্যানার্জি ওরফে রুদ্র। পেশায় রাজনীতি ও কূটনৈতিক সাংবাদিক হলেও আপাতভাবে সবটাই কাব্যিক। ওর জীবন, চলাফেরা কথাবার্তায় কোথাও সেসবের ছাপ নেই। রাজপুরের গ্রামের বাড়ি থেকে আজ ওর দিল্লিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা পর্যন্ত কোথাও বাস্তবিকতার ছাপমাত্র নেই। সবটাই যেন আবেগ আর কল্পনায় ভরপুর। মাঝে মাঝে ভাবে হয়তো সেই জন্যই...

নিরুপমার সঙ্গে প্রথম প্রেমটা কেটে যাওয়ার প্রায় ৫ বছর পর ওর জীবনে এসেছিল সুরঞ্জনা ব্যানার্জি। আড়ালে আবডালে তাকে মেমসাহেব বলে ডাকত। কোথাও যেন এই নামটার প্রতি ওর দুর্বলতা ছিল। হবে নাই বা কেন, এই বইটা পড়েই তো সরকারি চাকরির হাতছানি, সবার পরামর্শ উপেক্ষা করে খবরের নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল খবরের নেশায়। কলকাতায় কাজ করতে করতে যখন দিল্লিতে ও প্রথম চাকরি পায়, একপ্রকার জোর করে রীতিমতো ঝগড়া করে সুরঞ্জনাকে ডেকে সোজা নিয়েছিল মোহরকুঞ্জে। গরমের পড়ন্ত বেলায় প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে (কিছুটা রাগে, কিছুটা ক্লান্তিতে) হাজির হয়েই একচোট ঝাঁজিয়ে উঠেছিল রুদ্রর ওপর। তবে সেসবে মাথা না ঘামিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় অত্যন্ত খুশিতে (সবসময় রুদ্র এরকমই থাকে)ওর রাগ, ক্লান্তি উপেক্ষা করে হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ঘাসের ওপর বসে বলল, "চোখ বন্ধ করো", "কেন বলত, এভাবে ভরদুপুরে কেন তলব জানতে পারি কি", পরেই ভালভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে, "দ্যাখো বাবু আমাদের কিন্তু এইভাবে সময়গুলো নষ্ট করলে চলবে না, আগামিদিনে আমাদের অনেক পথ চলতে হবে, তুমি প্লিজ একটু কাজ আর পড়াশোনায় মন দাও আমি কোথাও যাচ্ছি না তোমায় ছেড়ে।'' ব্যাস, মক্ষম অস্ত্রটা পেয়ে গেল রুদ্র, সুরঞ্জনা একটু অন্যমনস্ক হতেই ওর হাতে দিয়ে দিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। ব্যাস! খুশিতে আরও কিছুক্ষণ সেখানে প্রেম আর ভবিষ্যত পরিকল্পনায় ভেসে গিয়েছিল দুজনে। দিন কয়েক কাটতেই দিল্লি পাড়ি দেয় রুদ্র, স্টেশনে ছাড়তে এসেছিল সুরঞ্জনা, রুদ্রর মেমসাহেব। একে অপরের হাতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিল অবিলম্বেই দিল্লিতে দুজনের সাক্ষাৎ হবে।

বকুক বকুক বকুক

না সেটা আর হয়নি। কোনও এক কারণে ছিটকে গেছে দুজনে। আলাদা পথে রওনা হয়েছে সুরঞ্জনা। দিল্লি আসার পর রাতের পর রাত ফোনালাপ দুজনের। রুদ্র বারবরই একটু আবেগপ্রবণ। প্রেম, ভালবাসা, আদর, সম্ভোগ সবই ছিল তারমধ্যে। ভার্চুয়াল জগতের কথোপকথনে উঠে আসত সবই। সব ছাড়িয়ে কোনওদিন উঠে আসত রাজনীতি, কোনওদিন নেতাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা, কোনওদিন হাল্কা ইয়ার্কি...। আবার কোনওদিন গান গাইত আর শুনত সুরঞ্জনা। ও বলত কম, শুনত বেশি। রুদ্র কখনও জিজ্ঞেস করত চুপ থাকার কারণ, আবার নিজেই উত্তরে বলত "আসলে আমি এত কথা বলি, তুমি বলার সুযোগ পাও না , তাই তো"? সেই রুদ্র স্মিতভাষী, গম্ভীর, কোথাও যেন হারিয়ে গেছে সেই অম্লান হাসিটা।

অতীত মানুষকে নাড়িয়ে দেয়। রাতের দিল্লি ক্লান্ত শরীরে গা এলিয়ে দিয়েছে কালের কোলে। প্রকৃতির সব আলো নিভে এসেছে। লাইটের আলোয় উজ্জ্বল দিল্লি আর ব্যলকনিতে দাঁড়িয়ে একাকী রুদ্র, স্মৃতির ভারে জর্জরিত হয়ে পাড়ি দেয় ঘুমের দেশে। আবার আসবে নতুন সকাল, উঠবে সূর্য, আবার হঠাৎই শুরু হবে মেমসাহেবের সঙ্গে ওর দ্বিতীয় ইনিংস....উত্তর টা জানা নেই....

***

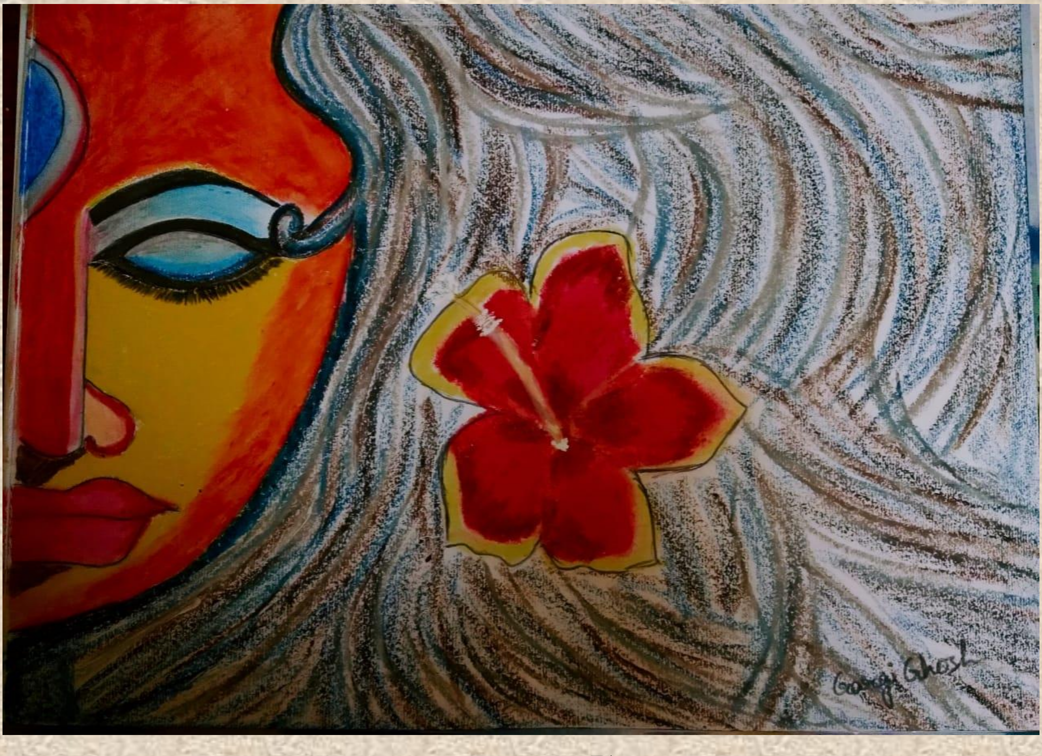

চিত্র শিল্পীঃ**গার্গী ঘোষ**

ফিনফিনে শাড়ি, বৃষ্টি আর অনন্ত দীর্ঘশ্বাস...

দিব্যেন্দু ঘোষ

ইটস রেনিং, ইটস হট, রিয়েলি হট

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

তামাকপায়ীদের বলছি না যারা আয়েশে সুখটান দেন, তারা জানেন, সিগারেট বা চুরুটের মশলার প্যাকেটে কী লেখা থাকে... *'cigeratte smoking is injurious to health.'* তবুও পান করেন। আসলে সবটাই নেশা। এটাও নেশা। এই নেশার নাম সাহিত্য-পান। তবুও বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থাকে। থাকা উচিত। এ লেখাতেও আছে ।

প্লিজ, রক্ষণশীলরা এ লেখা পড়ার দুঃসাহস দেখাবেন না। রক্ষণকে বেড়া দেওয়ার কোনও রক্ষণে লেখাতে নেই। সবটাই 'অ্যাটাকিং গেম।' আসলে ওই যে কথায় আছে না, 'অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স।' চুপটি করে ছুটির আগের রাতে পড়ুন। কারণ ঘুম উড়তে পারে। স্বপ্নে কিলবিল করতে পারে ধোঁয়া ওঠা সুইমিং পুলে একঝাঁক সেমি-নগ্নিকার উদ্দাম জলকেলি আর না হলে হোস্টেলের সেই ফুটন্ত জীবনের নাড়া দেওয়া স্মৃতি রোমন্থন। সাহেব-মেমদের কি হায়ালজ্জা থাকতে নেই গো! বর্ণে-গন্ধে-ছন্দে-পর্ণে তুমি যে দিয়েছ দোলা। কী কাণ্ড, কী কাণ্ড। স্বপ্নিল ফেননিভ আদিম রাতের উদোম হিম। বৃষ্টিস্নাত দুপুরে আড়মোড়ায়িত আয়েশি আঘ্রাণ, সাদা কাপড়ভেদী তাড়না, নেলপলিশ লাগানো পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে অবারিত বৃষ্টিধারা, যে ধারা ছুঁয়ে যায় পুরুষমনের প্রতিটি আকাঙ্ক্ষার ওলিগলি। দীর্ঘায়িত দীর্ঘশ্বাস কামনার কপিকলে বাঁধা ধুকপুক ধুকপুক শব্দদানব গভীর রাতের বুকে যেন ফেটে পড়তে থাকে।

শুরুটাই যে দৃশ্য দিয়ে

তামিল ছবি। বিদঘুটে একটা নাম। হিন্দিতে ডাবিং হয়েছিল। নামটা বলছি না। হেব্বি হিট। দক্ষিণে সাড়া ফেলে দিয়েছিল একটা সময়। সে কিছুকাল আগের কথা। শুরুর দৃশ্যেই বাজিমাত। উষ্ণতার আতরে জারিত শরীরি কামনায় থরোথরো। বৃষ্টির মেজাজি ব্যাটিং। জলের ফোঁটার সঙ্গেই ক্যামেরা প্যান করে ধরতে থাকে ব্যথা জাগানিয়া জঙ্ঘা। বৃষ্টি না পড়লে জানা হয় না, শরীর জুড়ে সোঁদা গন্ধ জন্ম না নিলে জানা হয় না, তাই তো বৃষ্টির বড় দরকার। পর্দা-ঘেরা চোখ থেকে পর্দা সরানোর কাজটাও যেমন আয়েশে সম্পন্ন করে, ঠিক তেমনই বৃষ্টিস্নাত দুপুরে জানিয়ে দিয়ে যায় যে পিচ্ছিল ওই পথে পা রাখা বড় মোলায়েম।

ফিরে আসা...

কচি বয়সে পাড়ায় পাড়ায় ভিডিও হলের গজিয়ে ওঠা দেখা। ভিতরে কী চলত, জানার উপায় ছিল না। গোঁফ না গজালে 'নো এন্ট্রি|' আঠারো ফাটারোর অত কড়াকড়ি ছিল না বটে, তবে ভিডিও অপারেটর চেনা মুখ হলে তো ধারে ঘেঁষাই কঠিন। তবে দু-এক পিস বখাটে বন্ধু যে ঢুঁ মারত না অন্ধকার ঘুপচি হলঘরে, তা নয়। টিফিন টাইমে পাঁচিল টপকে দে ছুট লাস্ট বেঞ্চের কিছু বদ ছোকরা। তাদের দু-একজনের মুখেই শোনা সিনেমায় বৃষ্টির কী মাহাত্ম্য। হলের ভিতর জমজমাট বই। কোনও রুপোলি পর্দা নয়, একুশ ইঞ্চি রঙিন টিভির ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে গল্পের সব চরিত্র। পাশেই রাখা কালো রঙের যন্ত্র। জাপানি কোম্পানির ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার। চওড়া ফিতেওয়ালা ক্যাসেট ঢুকে যায় ভিসিপির গহ্বরে। ঘুরে ওঠে স্টিলের গোল চাকা। জড়িয়ে যায় দেহবোধ আর মৃদু যৌনতার ইশারা সংবলিত ক্যাসেটের কালো ফিতে সেই চাকার গায়ে। ইলেকট্রনিক্স কর্ড বেয়ে সেই ইশারা ফুটে ওঠে টিভির সামনে কাচের ইলেকট্রনে। শুরু হয় বৃষ্টি। বিচিত্র সুরওয়ালা গানের হাত ধরেই আসে মেয়েটি। চোখেমুখে লেগে থাকে আহ্বান। গায়ে ফিনফিনে সাদা শাড়ি, বুকে সাদা ব্লাউজ, পিছনে শুধু একটা সাদা দড়িতে আলতো গিঁট। মসৃণ পেলব পিঠ। নাভির নীচে শুরু শাড়ির দ্বিতীয় পরত। খালি পা, পায়ে রুপোর নূপুর, পায়ের সুন্দর করে কাটা আঙুলে মিষ্টি রঙের প্রলেপ, নাভির গভীর গর্তের ওপর বেড় দিয়ে জড়ানো সরু রুপোর চেন, সামনে ছোট্ট দুটো ঝুমকো দিয়ে আড়াল করা। তাতে কি আর আড়াল থাকে? যেন পদ্মপাতায় টলটলে একবিন্দু জল। বৃষ্টির ফোয়ারা নামতেই ভিজতে থাকে শরীর, বাড়তে থাকে উষ্ণতা, জাগতে থাকে শরীর, ঘুম ভাঙে কামনার। সাদা ব্লাউজের নীচে যে কোমলতার উপাদান, বৃষ্টি এসেই উন্মুক্ত করে দিল সেই কোমলতা। বুকে লেপ্টে থাকা সাদা ব্লাউজ ভেদ করে চোখের সামনে তখন যৌনতার বেলাভূমি| বিস্ফারিত দুচোখ তখন দৃষ্টিসুখের অবাধ বারিধারায় ভিজছে চুপচুপ| দুই কালো ভ্রমর তখন মুক্তির নেশায় ছটফটাচ্ছে। দুই বুকের গভীর খাঁজ বেয়ে তখন অবাধ্য জলরাশি নিম্নগামী। নাভির গভীরতায় হারিয়ে যাওয়ার নেশায় দুদ্দাড় দাপাচ্ছে ফোঁটাগুলি। আর তার পরেই যেন অসাড় হয়ে আসে দুচোখ। চোখের সামনে মাখনের পেলবতা, জলভরা দুটি কলসি যেন উপুড় হতে ব্যস্ত, মসৃণ দুই কলাগাছের গুঁড়ি তখন ভিজছে আকণ্ঠ। বাসনার ঘুণপোকারা তখন কুরে কুরে খাচ্ছে মস্তিষ্কের কোষগুলি। অন্ধকার ভিডিও হলের ভিতরের বাতাস তখন ভারী। আবছা টিভির আলোয় নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে একটা হাত ঘোরাফেরা করে তাদের কোমরের নীচে, কেউ-বা টিভির পর্দা ছুঁতে চায়, সিন রিপিটের জন্য চিৎকার| তখন রিওয়াইন্ড করে ক্যাসেটের কালো ফিতে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে হয় খানিকটা। আবার সেই সদ্য-দেখে-ফেলা দৃশ্যের অবতারণা, কোমরের নীচে হাতের গতি বাড়তে থাকে, নিঃশ্বাস আরও ঘন হয়, আরও ঘন, হঠাৎই তখন শরীর থেকে মুক্তি ঘটে সাদা শাড়িটির, তখন সে নাভিরঙা শাড়ি বারবার বদলাতে থাকে কামনার দৃশ্যপট। মিলনপিয়াসী শরীরে তখন উথালপাথাল ঢেউ| বৃষ্টির ছাঁটে কমার থেকে বরং বাড়তে থাকে উষ্ণতা। ভিডিও হলটি তখন হয়ে ওঠে একফালি পর্ণ-কুটির। বৃষ্টি পড়তেই থাকে, সে পড়ার কোনও শেষ নেই। এক সিন থেকে আরেক সিন, এমনই চলতে থাকে সিনান্তর| কিন্তু বৃষ্টির রঙ বদলায় না, কামনার রঙ আরও গাঢ় হয়।

জল পড়ে আগুন ধরে..

আশ্চর্য আখ্যানই বটে। তা না হলে আগুন নেভায় যে জল, সেই কিনা জ্বালিয়ে দিচ্ছে আগুন। রুপোলি পর্দায় ভেসে বেড়ায় নায়িকার শরীর, আর সেই শরীরে ভেসে বেড়ায় বৃষ্টির ফোঁটা, দর্শকমনে তখন ভেসে বেড়ায় কামনার পোকামাকড়...

সিনেমা এবং...

সিনেমা মানে বিনোদন| সিনেমা মানে গল্প। সিনেমা মানে প্রেম| সিনেমা মানে গান। সিনেমা মানে নাচ। সিনেমা মানে বৃষ্টিতে ভিজে রোম্যান্স। সিনেমা মানে চুমু। সিনেমা মানে বিছানা। সিনেমা মানে নগ্নতা। সিনেমা মানে সেক্স। সিনেমা মানে কমপ্লিট প্যাকেজ। সেই প্যাকেজেরই একটা অংশ বৃষ্টি। কে জানে কোথা থেকে বৃষ্টি আসে, বর্ষা না এলেও, মেঘ না ডাকলেও বরুণ দেবতার কৃপাদৃষ্টি পড়বেই। শুধু প্রেম জমে ওঠার অপেক্ষা। প্রেমিকের সাদা ফিনফিনে জামা, কালো প্যান্ট আর প্রেমিকার সাদা ফিনফিনে শাড়ি এবং কিচ্ছু না...একদম জমে আইসক্রিম। ঠোঁটে, নাকে, চিবুকে, গালে মেখেটেখে একশা| প্রেম জাগানিয়া, সেক্স উথলে ওঠা বৃষ্টির দৃশ্য। তারপর তো ঠোঁটে ঠোঁট আর বিছানায় ধামসাধামসি। কী পরম নিপুণতায় কোমর পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া নায়ক-নায়িকার শরীর। ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণহীন। হাত আর কাত-হওয়া শরীরের পাশ দিয়ে একঝলক নগ্ন স্তনে উঁকি, এ যেন সিনেমায় বড়ই জলভাত| কোনও দৃশ্য দেখে সিনেমা হলে কতগুলো সিটি পড়ল, সেটাই কিন্তু সেই ছবির এক মস্ত টিআরপি আর এই টিআরপি-তে অনেকটা এগিয়ে থাকবে বৃষ্টির সেই দৃশ্যগুলি, যেখানে অনন্তকাল ভিজতেই থাকে নায়িকা-শরীর, তবুও ঠান্ডা লাগে না, হ্যাঁচ্চো করতেও দেখা যায় না বৃষ্টিভেজা নায়িকাকে। অদ্ভুত এক মায়াবি খেলা। যে খেলায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে এক নারী শরীরের চড়াই-উতরাই, অলিগলি, শিখরচূড়া বা অন্ধকার গুহা...

সেই সব লাস্য...

কখনও ভালবাসা, কখনও তীব্র কষ্ট ও হতাশা, কখনও বিরহ কখনও আবার যৌনতার অনুষঙ্গ। বাণিজ্যিক ছবি মানেই বৃষ্টিতে গানের দৃশ্য চিত্রায়নের মূল উদ্দেশ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর বৃষ্টিভেজা দেহ প্রদর্শন। মাঠেঘাটে, সমুদ্রতটে বা মনোহারী আইল্যান্ড হলে তো ভালই, তা না হলে স্টুডিওর অভ্যন্তরেও ঘনিয়ে আসে মেঘ, নামে কৃত্রিম বৃষ্টি, বৃষ্টিভেজা গানে লাগে আগুনের পরশ, রচিত হয় কালজয়ী কিছু গান| দর্শকমনে গ্রথিত হয় নায়িকার শরীরের আঁকবাঁক, বৃষ্টিতে যা হয়ে ওঠে আরও দৃশ্যমান| চোলিকে পিছে বা চোলিকে নীচে তখন নশ্বর জবানির জলকুসুম। প্রাপ্তবয়স্ক রসের আড্ডার তুমুল হর্ষধ্বনির উৎস। মুখে মুখে ঘুরতে থাকে

চিক্কন নায়িকার শরীরি বিভঙ্গ। ফাটাফাটি তর্ক জোড়ে চায়ের ঠেকে। কার নাভি কতটা গভীর, কাজল না শিল্পা শেট্টি। কার বুকের চড়াই মনে কতটা দাগ কাটে, শ্রীদেবী নাকি মনীষা কৈরালা। কার নিতম্বের দোলায় বুকে কতটা মোচড় লাগে, স্মিতা পাটিল নাকি রেখা। জল পড়ে কার ঠোঁটে কতটা আগুন, ঋতুপর্ণা নাকি স্বস্তিকা| কার বুকে কতটা ওম, শ্রাবন্তী নাকি পায়েল......ভাঁড়ের পর ভাঁড় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এ তর্ক থামার নয়| কখনও শাড়ি কখনও ফ্রক, কেউই ঢাকে না কিছু, জল পড়লেই কেল্লা ফতে| ফর্সা পা, সপাট পেট, নিম্ননাভির আড়াল তখন খুল্লামখুল্লা রসনার তৃপ্তি লাগি...

গরম শরীরের বিচারের ভার নরম পাঠকের হাতে...

১৯৪২-এ লাভ স্টোরি ছবিতে রাহুল দেব বর্মণের অসাধারণ সুরে কুমার শানুর গাওয়া 'রিমঝিম রিমঝিম' গানের বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিতে মনীষা কৈরালা।

নিমক হালাল-এ অমিতাভ-রেখার সে কী ডুয়েট, আজ রাপাট যায়ে... কিশোর কুমারের গলা বেয়ে স্মিতার শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আগুন।

চালবাজ ছবিতে 'না জানে কাহাসে আয়ি হ্যায়' গানে শ্রীদেবী। '

দিল তো পাগল হ্যায়' সিনেমায় 'কোই লাড়কি হ্যায়' গানের সঙ্গে মাধুরীর অসাধারণ নাচ।

'শ্রী ৪২০' ছবিতে বৃষ্টিভেজা রাজপথে নার্গিস ও রাজ কাপুরের হেঁটে চলা। বুকে কাঁপন ধরানো নার্গিসের বৃষ্টিস্নাত শরীর। তার সঙ্গে 'পেয়ার হুয়া ইকরার হুয়া'-র মতো ক্লাসিক গান। '

চলতি কা নাম গাড়ি' সিনেমায় বৃষ্টিমুখর রাতে নায়ক কিশোর কুমারের জীবনে আসে মধুবালীরুপী সেক্স গডেস| জলপতনের মধুর শব্দ আর 'এক লাড়কি ভিগি ভাগি সি।'

চামেলি ছবিতে করিনা কাপুরের সঙ্গে রাহুল বোসের বৃষ্টিমুখর রাতের সেই কামনায়িত বাসনা, সঙ্গে ভাগো রে মান গানটি।

সুভাষ ঘাইয়ের তাল সিনেমার অঝোর বর্ষণ, সবুজ শৈলশ্রেণি, ঐশ্বর্য রাইয়ের বৃষ্টিভেজা শরীরের তাজা আঘ্রাণ, কোমরের নাচন, নাভির গভীরতা আর এ আর রহমানের সুর তাল সে তাল মিলা যেন এক অনন্য ঐকতান।

গুরু ছবিতে শ্রেয়া ঘোষালের গলায় 'বারসো রে' গানের সঙ্গে পাহাড়ি জলপ্রপাত ও ঐশ্বর্যার নাচ, মন্দিরের ভাস্কর্য ও গ্রামের বর্ষামুখর দৃশ্য।

রাজ কাপুরের 'সত্যম শিবম সুন্দরম' ছবির ক্লাইম্যাক্সে প্রবল বৃষ্টির ভিতর শশী কাপুরের খুঁজে পাওয়া জিনাত আমনকে। সেই সঙ্গে গান সত্যম শিবম সুন্দরম।

কল্পনা লাজমির রুদালি ছবিতে খরাপীড়িত রাজস্থানের গ্রামে ডিম্পল কাপাডিয়া বৃষ্টিতে বাড়িয়ে দেয় হাত, ফুটে ওঠে আকাঙ্ক্ষা।'

'মোহরা' ছবিতে 'টিপ টিপ বারসে পানি'-র সঙ্গে রবীনা ট্যান্ডনের সেক্সি নাচ পানিতে আগ লাগিয়ে দেয়| '

মিস্টার ইন্ডিয়া' ছবিতে 'কাটে নেহি কাটতে' গানের দৃশ্যে শ্রীদেবী।

'চাঁদনি' ছবিতে 'লাগি আজ শাওন কি' গানে শ্রীদেবীর নাচ। '

'ফানা' ছবিতে 'ইয়ে সাজিশ হ্যায় বুন্দো কি' গানে বৃষ্টিভেজা কাজল।

'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' ছবিতে 'মেরে খোয়াবো মে যো আয়ে' গানে কাজলের নাচে আবেদনের ইতিবৃত্ত। '

'ফারার' ছবিতে অমিতাভ ও শর্মিলা ঠাকুরের বৃষ্টিস্নাত পর্দা-রোমান্স জমে ওঠে 'ম্যায় পিয়াসা তু শাওয়ান' গানের সঙ্গে| '

'পিয়াসা শাওন' ছবিতে 'মেঘা রে মেঘারে' গানে জিতেন্দ্র ও মৌসুমি চ্যাটার্জির রোমান্স। '

'আয়া শাওন ঝুমকে' ছবিতে 'আয়া শাওন' গানের সঙ্গে আশা পারেখ-ধর্মেন্দ্র।

'অভিনেত্রী' ছবিতে ও 'ঘাটা সাওয়ারি' গানে শশী কাপুর-হেমা মালিনী। '

আজনাবি' ছবিতে 'ভিগি ভিগি রাতো মে' গানে রাজেশ খান্না-জিনাত আমান। '

'বেতাব' ছবিতে 'বাদল ইয়ু গরাজতা হ্যায়' গানে অমৃতা সিং-সানি দেওল। '

হামতুম' ছবিতে 'সাসো কো সাসো মে' গানের সঙ্গে সাইফ-রানির রোম্যান্স। '

'দেবদাস' ছবিতে 'সিলসিলা ইয়ে চাহাত কা' গানের দৃশ্যায়নে ঐশ্বর্যার নৃত্যভঙ্গিতে ফুটে ওঠে ভালোবাসার নিবিড়তা। '

'সারফরোস' ছবিতে 'জো হাল দিল কা' গানে সোনালি বেন্দ্রের আগুনঝরানো লাস্য| '

'বাঘি' ছবিতে টাইগার শ্রফ ও শ্রদ্ধা কাপুরের বৃষ্টিভেজা চুমুর দৃশ্য। '

'গোপালা' ছবিতে চাঙ্কি পাণ্ডে ও রূপা গাঙ্গুলির বৃষ্টিভেজা ও শয্যাদৃশ্য। '

পদ্মা নদীর মাঝি' ছবিতে সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুকুরে ভিজে-কাপড়ে ঘনিষ্ঠ রূপা গাঙ্গুলি।

'লাল গোলাপি অঙ্গ আমার...

গভীর হয় রাত।' পর্দায় সদ্য দেখা ফরসা মেয়েটায় বুঁদ। না-দেখা সেই অধীরটানে আকাশপানে দুহাত তুলে বৃষ্টির জন্য কাতর আবেদন। বৃষ্টি নামলে কল্পনায় নেমে আসবে রাতপরীরাও। যাদের শরীরেও থাকবে না তেমন কোনও পোশাক, প্রায় নগ্ন শরীরে উথালপাথাল ঢেউ বইবে, যে ঢেউয়ে দুলে উঠবে বাতি, কঠোর হবে পৌরুষ। ফিনফিনে রাতপোশাক ভেদ করে মাখনে ডুবে যাবে দুটি হাত, নেমে আসবে কোমরে, আলতো চাপে নারীত্বের গভীরে ডুবে যাবে উদ্ধত পৌরুষ। আখ পেষাইয়ের মেশিনটা অনন্তকাল চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে, পর্দায় বৃষ্টি নামার প্রার্থনা আমূল বদলে যাবে শরীরে বৃষ্টি না-নামার আকুতিতে। এমনই চলতে থাকুক। অসহ্য সুখ। বৃষ্টিরা দাঁড়িয়ে থাক অন্ধকার গভীর গুহার ওপারে..

***

চিত্র শিল্পীঃ**গার্গী ঘোষ**

বকুক

আমি তখনও ...

অজ্ঞাত গোলপ

কিছু পেয়ে তো অনেক কিছু হারিয়েছি।

কিছু হারিয়েও হয়তো অনেক কিছু পেয়েছি।

একটা সকাল এমন আসবে যখন হয়তো তুই থাকবি না আমার পাশে।

অন্য কেউ হয়তো তখন তোর অনেকটা মনের কাছাকাছি।

ভালোবাসা নিয়ে হয়তো বলা হয়ে উঠবে না ভালোবাসি।

সেই সকালে তুই হয়তো ব্যস্ত, অন্য কারোর অফিসের টিফিন গোছাতে।

তাকে হয়তো বেরনোর আগে বলবি তাড়াতাড়ি ফিরো, আর সময় মতন খাবারটা খেয়ে নিও।

কিন্তু আমি তখন হয়তো অপেক্ষায় আছি, দেওয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

না হয় কোনও এক শান্ত ঝিলের ধারে বসে আছি একা একা তোর স্মৃতি নিয়ে।

ওপারে তখন ভাঙন, ধান ভর্তি নৌকা নিয়ে মাঝি ভাই যায় গঞ্জের পারে।

তার গলায় হয়তো একই সুর,

"সোনা বন্ধুরে কোন দিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাও কইয়া যাও রে।"

দুপুরে কাজ শেষ করে তুই হয়তো কিছুটা ক্লান্ত, সোফা কিংবা চেয়ারে বসে ভেবে চলেছিস রাতে কি রান্না করব তার জন্য।

কিন্তু হাতে তো খোলা সেই পুরনো ম্যাগাজিন।

এরকমটাই হয় তো হয় বল।

হয়তো একটু আনমনা কিংবা হঠাৎ দুচোখ ভেঙে আসে ক্লান্তিতে।

যখন ক্লান্তি ভাঙ্গে তখন হয়তো কানে আসে রান্না ঘরে প্রেসার কুকার টা সিটি দিচ্ছে।

তড়িঘড়ি উঠেই চটজলদি রান্নাঘরে গিয়ে দেখলি কাবলি ছোলাটা একটু বেশিই সেদ্ধ হয়ে গেছে।

তখন আমি বসে ঝিলের ধারে, খুব চেষ্টা করছি জীবনটাকে আরও একবার ফিরে দেখার।

কমলা রঙের সূর্যের রশ্মি ঝিলের জল, আর মাঠের ঘাসগুলোকে এক অপূর্ব রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছে।

হয়তো সেই দিন বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মী পূজার ব্রত শেষে শাশুড়ি মা তেল সিঁদুরে একটু বেশি রাঙা করে দিয়েছে সিঁথিটা।

ঘরের লক্ষী ব্রত মা লক্ষ্মীর ব্রত এ।

দুপুরের খাওয়া শেষে হয়তো একটু বারান্দার রোদ্দুর এসে দাঁড়ানো।

আর মনে মনে কিছুটা ভাবনা, ইস কত স্বপ্ন ছিল নিজের চাকরি।

থাক সেসব

ওর সারাদিনের তো খাটাখাটনি তো আমাদেরই জন্য।

সকাল থেকে খাটাখাটনির পর কিছুটা একার সময়।

শীতের পড়ন্ত বিকেলে ছাদে উঠে হঠাৎ চোখে পড়ল তোর দুটো ঘুড়ি, একে অপরের সাথে প্যাচ লড়ছে।

ছাদে ফুলের টব গুলোতে জল দিয়ে, শুকনো কাপড় তুলে আবার ঘরে ফিরে আসা।

যেভাবে প্রতিদিন বহু পরিযায়ী তাদের বাসা খোঁজে।

ঠিক সেইভাবে।

সন্ধ্যার গরম চায়ের পেয়ালার সাথে, শাশুড়ি বৌমা একসাথে নিহত কোনও পারিবারিক ধারাবাহিকে।

তখনও আমি বসে ঝিলের ধারে, হয়তো ভাবছি কলেজ কিংবা প্রাইভেট টিউশনের শেষে সন্ধ্যা গুলো কাটতো আমাদের একসাথে।

একটু অন্যমনস্ক ভাবে চোখটা পরল ঘড়ির কাঁটায়।

তড়িঘড়ি বসার ঘরের চেয়ার আর ধারাবাহিক ছেড়ে উঠে পড়া।

সন্ধ্যার জলখাবারটা বানাতে হবে, সাথে রাতেরও।

অফিস থেকে ও এসে পরবে। সারাদিন খাটাখাটনি।

আজ সেদ্ধ জলখাবারের গন্ধে ম ম করছে গোটা বাড়ি, তারই মধ্যে হঠাৎ কলিংবেলের শব্দ।

তোর একবারও বুঝতে অসুবিধা হবে না সে এসে গেছে।

তড়িঘড়ি হোলদে হাতটা কাপড়ের আঁচলে মুছে দরজা খোলা।

অফিসের ব্যাগ আর ক্যাসারোল টা হাত থেকে নিয়ে একটাই প্রশ্ন,

খুব ক্লান্ত না।

তুমি ফ্রেশ হও আমি চা জলখাবার দিচ্ছি।

তখন হয়তো সদ্য আমি ঝিলের পার থেকে উঠে আঁকাবাঁকা গ্রামের মেঠো পথ ধরে কোন এক চায়ের দোকানে।

ভাঁড়ে চা সাথে গ্রামের নোনতা বিস্কুট।

তখন তোর হয়তো কানে যাবে রান্নাঘর থেকে কেউ তোকে সোহাগী কন্ঠে ডাকছে।

কি গো শুনছো, একটু এদিকে আসো তো, একদমই ইতস্তত না করেই একটু ধীর পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ানো।

সোহাগী প্রশ্ন-উত্তর শেষে ঠোটের কোনায় কিঞ্চিৎ হাসি নিয়ে আবার হয়তো তুই গিয়ে দাঁড়াবি রান্নাঘরে।

কিন্তু আমি তখনও ভেবে চলেছি বাংলা কোচিন টা শেষ করে, আমরা উত্তর কলকাতার ঐ একই রকমই আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে একসাথে বাড়ি ফিরতাম।

সন্ধের শেষে, রাত যখন ধীর পায়ে উঁকি দেয় তোর জানলায়।

তখন হঠাৎ করে তার মাথায় পরিকল্পনা আসে আর বাড়িতে নয়, ডিনারটা করব বাইরে।

কাল তো অ্যানিভার্সারি।

রাত বারোটায় একান্তে দুজনে সেলিব্রেট করব দিনটা।

ঝটপট তোর নিজেকে সাজানো।

ঠিক আগের মতন খুব ছিমছাম।

ছোট্ট টিপ, আজ হালকা রঙের শাড়ি নয়, একটু ডিপ।

কোন এক পাঁচতারা হোটেলে কিংবা শহরের কোন নামী রেস্তোরাঁয় দুটো চেয়ার, রাতের খাবারটা মোমবাতির আলোয়।

ঝালিয়ে নেওয়া সম্পর্ক, খুব সুন্দর থেকে মধুর হয়ে উঠুক এই কামনায় হয়তো দুজন।

কিন্তু তখন আমি সেই ছোট্ট গ্রামের কোন এক অনামি হোটেলে রুটি সবজি।

রাত বাড়ে শহরের স্ট্রিট লাইটের আলো গুলো আরও বেশি তীব্র হয়, ক্লান্ত আমার শহর, নিয়ন থেকে রক্তিম হয়ে ওঠা সম্পর্কে তখনও ক্লান্তি নেই।

কেমন একটা চির ধরানো আদিম সভ্যতা, নীল থেকে নাইজেলের পাড়ে।

আমি তখনও নাম না জানা সেই গ্রামের কোন এক মাটির দাওয়ায়ে হ্যারিকেনের আলোয়ে, জীবন জোছনা খুঁজে বেড়াচ্ছি অমাবস্যার গহন রাতের নিঝুম নিশিতে।

সেলিব্রেশন শেষে বাড়ি ফেরা, রাতের শেষ ভাগের রাতে।

রাতের শেষভাগে রাতকে কি বলে জানিস?

মালোশ্রী।

সেই সোহাগী সম্পর্ক আরও বেশি করে গভীর হয় মালোশ্রীর শেষভাগে।

দিনের শেষে ক্লান্তি কাটে মনের মানুষের কাছে।

এভাবেই হয়তো কেটে যাচ্ছে কিংবা কেটে যাবে দিনগুলো।

যে সম্পর্ক কখনোই গড়ে ওঠেনি, আর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পান পাতা আর শুভদৃষ্টিতে, তার সাক্ষী থাক না হয় হোমের আগুন।

আর বয়ান লিখে যাক সেই অনামিকা গ্রামের সন্ধ্যার নিয়ন আলোয়ে একটু একটু করে ভাঙতে থাকা ঝিলের দুই পাড়।

আমি না হয় তখনও খুঁজে বেড়াব অমাবস্যায় রাতের জ্যোৎস্না কিংবা মধ্যরাতের শেষ ভাগের সোহাগী মালোশ্রি'কে।

***

চিত্র শিল্পীঃ**গার্গী ঘোষ**

বকুক বকুক বকুক

তৃষিত মন

অজন্তাপ্রবাহিতা

প্রতিদিনের মতোই ভোরের পাখিদের কলকাকলীতে ঘুম ভাঙে কেয়াদেবীর। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর থেকে উনি ঘরবন্দি। গত পাঁচ বছর ধরে কলকাতার হাইল্যান্ড পার্কের ন'তলায় থাকা থ্রি বি-এচ-কে ফ্ল্যাটের কোনার ঘরটা ওনার দুনিয়া। ক'দিনের হাই টেম্পারেচারের পরে শরীরে যেন আজ একটু আরাম আছে বলে মনে হচ্ছে। বালিশের পাশে রাখা চশমাখানা পরে দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে দেখলেন। পৌনে পাঁচটা বাজে। ঘরের ভেতরে সব কিছু টিপটপ দেখে বুঝলেন বুবুনের সব দিকে খেয়াল আছে। মিনিট পনেরো পরেই পিপিই পরিহিতা নার্স শেফালী ঘরে ঢুকলো। এই কদিন ধরে এই একটি প্রাণী ঘরে আসা যাওয়া করেছে।

"গতকাল থেকে আর স্যালাইনের প্রয়োজন হয়নি। আজ বিপিটাও ঠিক আছে আর অক্সিজেন লেভেলও নব্বইয়ের ওপরে। আপনি কিন্তু ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন মাসিমা। একবার অক্সিজেন লেভেলটা স্টেবল হলেই আপনার এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি। তারপর আবার নাতির সাথে খেলতে পারবেন। " মুক্তি কথাটা কানে পড়তেই একটু হেসে উঠলেন কেয়াদেবী।

"আজ কত তারিখ গো ?" অস্‌ফুট আওয়াজে জিজ্ঞেস করলেন।

"১৫ জুলাই।"

দেয়ালে টাঙানো বেশ বড় মাপের ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন," একটু ছবিটা নাবিয়ে দেবে?"

" হ্যাঁ দিচ্ছি " বলে শেফালী ছবিটা নামিয়ে স্যানিটাইজ করে বালিশের পাশে রেখে দিয়ে নিজের কাজ সেরে শেফালী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ও বাইরে যেতেই ছবির ওপর হাত রেখে কেয়াদেবী বলেন,

--- পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকীর অনেক শুভেচ্ছা অধ্যাপকমশাই। কুড়ি বছর আগে আজকের তারিখেই আমায় ছেড়ে চলে গেছিলে না ফেরার দেশে। অন্যদিনের চেয়ে আজকের দিনটা একদম অন্যরকম। অনেক না বলা কথা বলার আছে। আজ সেগুলো বলে নিতে দিও। কাজের অজুহাত দেখিয়ে আমায় চুপ করিয়ে দিও না। মনে পড়ে সেই দিনটার কথা? পঞ্চাশ বছর আগে আমার বয়স তখন কুড়ি, তোমার বয়স বত্রিশ। তোমার বৌ হিসেবে পা রাখলাম তোমাদের শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লীর বাড়িতে। বিয়ে উপলক্ষ্যে সারা বাড়িতে জমজমাট পরিবেশ। জলপাইগুড়িতে থেকে স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে আসতে পেরে মনে মনে আমার ভারী

আনন্দ হয়েছিল। তখন আমি সবে কলেজ পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়বার কথা ভাবছি। আমার এক আত্মীয়ের কাছে খবর পেয়ে তোমার মা আমায় দেখতে এলেন। এক দেখাতেই আমায় ওনার খুব পছন্দ হয়ে গেলো। সেইদিনই বিয়ের কথা পাকা করে ফেললেন। আগামিদিনে আমার পড়াশোনা জারি থাকবে এই আশ্বাস দেওয়াতেই এই বিয়েতে বাবা মা রাজি হয়েছিলেন।

বিয়ের পিঁড়িতেই তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা। তার আগে ছবি দেখেছিলাম বটে। চোখের সামনে তোমার শান্ত, সৌম, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে আমার মনের ভেতরটা সপ্ততন্ত্রীর বীনার ঝঙ্কারের মতো বেজে ওঠে। এক দেখায় ভালোবেসে ফেলি তোমাকে। ফুলশয্যার দিন মনে হয়েছিল অসীম গুণের অধিকারী এই মানুষটা শুধুমাত্র আমার, এই ভেবেই প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেলাম।

বিয়ের পরে বেশ কয়েক বছর আমার জীবনের দিনগুলো ছিল ঠিক রূপকথার গল্পের মতো । সেখানে তুমি রাজা আর আমি রাজ মহিষী। একে একে সব স্বপ্ন পূরণ হতে লাগলো। বুবুনের জন্ম হলো, আমার উচশিক্ষা সমাপ্ত হলো। আনন্দ আর সুখের সাগরে আমি ভেসে রইলাম দিনের পর দিন।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস শুরু হলো শ্বশুরমশাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে। শাশুড়িমায়ের ধৈর্য্য, স্নেহ আর বিচক্ষণতায় আমরা সবাই শোক ভুলে গিয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করছিলাম ঠিক সেই সময় কল্পনাও করতে পারিনি যে আরো অনেক যন্ত্রণা অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। সহকর্মী শ্যামলীর সাথে তোমার সম্পর্কের কথা মাঝে মাঝে আমার কানে আসতো বৈকি, প্রথম দিকে গুজবে কান দিইনি ঠিকই কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম এ নিছক গুজব নয় এ সত্য। চোখের সামনে পুরো পৃথিবী দুলে উঠলো, পায়ের তলার মাটি সরে গেলো যেন। অভিমানে ভরা হৃদয় নিয়ে তোমায় জিজ্ঞেস করলাম,

"আমার ভালোবাসায় কি কোনো খামতি ছিল? " খুব শান্ত কণ্ঠে তুমি উত্তর দিয়েছিলে, "কোনো মহিলা ও পুরুষকে মেলামেশা করতে দেখলেই সবাই সেই সম্পর্কের নামকরণের জন্য বড্ডো ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সব সম্পর্ককে 'প্রেম' নামের ছোট্ট বৃত্তে আবদ্ধ করা কি খুব প্রয়োজন? আজ 'শ্যামলীর জায়গায় যদি 'শ্যামল' হতো, তাহলে কি এতো গুজব রটতো ?"

তোমার যুক্তির সামনে দমে গেলেও, তোমার কথায় চুপ করে গেলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম আমি গো হারা হেরে গিয়েছি। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মালো। এমনকি আয়না দেখতেও ইচ্ছে করতো না। আমার পরিবর্তন শাশুড়িমায়ের চোখে ধরা পড়লো। উনি বোঝালেন, সংসার

টিকিয়ে রাখার জন্য মেয়েদের অনেক কিছু মেনে নিয়ে ভালো থাকার অভিনয় করতে হয়। "তাই করলাম। " কিন্তু সেই চেষ্টাও বৃথা হলো। শ্যামলীর ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যুর খবরটা তুমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলে না। অতিরিক্ত স্ট্রেসে তোমার প্যারালিটিক্যাল এটাক হলো। তোমায় শয্যাশায়ী দেখে শাশুড়িমাও শোক সামলাতে না পেরে চলে গেলেন। বছরবাদে আমার সবটুকু ভালোবাসা, যত্ন ও চেষ্টাকে অবজ্ঞা করে তুমি চলে গেলে না ফেরার দেশে।

আমার জন্য রেখে গেলে তোমার প্রিয় হাতল ওয়ালা চেয়ার, একটি অমূল্য লাইব্রেরি, পাহাড় প্রমাণ স্মৃতি। তোমার এই ইজি চেয়ারখানাই আমার সবসময়ের সঙ্গী হলো, সেখানে বসেই তোমার উপস্থিতি ও স্পর্শ অনুভব করতাম। বুবুন বলতো, "কেদারবাবুর প্রিয় কেদারায় কেয়া দেবীর নতুন ঠিকানা।" বুবুনের উৎসাহে আমি দুঃখকে সঙ্গ না করে কলমের সাহায্যে নিজের মতো করে আরেকবার জীবনকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। জীবনের দুষ্প্রাপ্য স্মৃতিকে একত্রিত করে আমার লেখা বই "তৃষিত মন " প্রকাশিত হলো।

বইটির সাফল্যে ও পাঠকের অবিশ্রান্ত ভালোবাসার স্রোতে আমি সীমাহীন ভেসে গেলাম। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখলাম।

জীবনকে কোনো পরিধির সীমাবদ্ধতায় বেঁধে না রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার তাড়নায় নিজের ব্যক্ত অব্যক্ত অনুভবগুলো মুক্ত করে দিলাম সবার মাঝে। অবিরাম লিখে গেলাম। পাঠকের স্বীকৃতি আমায় সাহস যোগালো। লেখক হিসেবে নিজের নতুন পরিচয় হলো , 'কেয়া কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়'।

কিন্তু, সুখ বোধহয় আমার ভাগ্যে সয় না । যেই সময়ে আমি সাফল্যের আনন্দে ডুবে আছি ঠিক সেই সময় একদিন বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে আমার কোমরের হাড় ভাঙলো। আরেকবার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেলো। শয্যাশায়ী হলাম বিছানায়। এক ভীষণ অসহায়তা গ্রাস করলো আমায়। বুকের ভেতরের আর্তনাদ চোখের জল হয়ে গড়িয়ে পড়লো।

বুবুনের পক্ষে বারেবারে শান্তিনিকেতন যাতায়াত করে আমার খেয়াল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়লো। অতএব, গুরুপল্লীর বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করা হলো। আমার সাজানো পৃথিবী বিলুপ্ত হলো। তাও হাল ছাড়িনি,অবশিষ্ট আশা আকাঙ্খা নিয়ে এই পাঁচ বছর বৌমা,দাদুভাই ও বুবুনের সাথে কাটালাম। কিন্তু এই কটা দিন গৃহবন্দি থাকার পরে আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না। আজ তোমায় কথাগুলো বলতে পেরে মনটা অনেক হালকা হলো,দিনের আলো নিভে এসেছে। রাত কত হলো কে জানে। অন্ধকারে দেয়াল ঘড়িটা দেখা যাচ্ছে না। বড্ডো ক্লান্ত লাগছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মায়া মোহের বাঁধন ছিঁড়ে এবার চলিতে হবে।

***

পজেটিভ

-অগ্নিমিতা দাস

জানলাটা খুলতেই ঘর সকালের রোদ্দুরে ভরে গেল। রায়না আজ অফিস যায়নি। কাল থেকে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। কাল রাতেই বন্ধু মেঘনা পইপই করে বলেছে টেম্পারেচার মাপিস, ফেলে রাখিস না। জ্বর বাড়লেই ফোন করবি টেস্টের জন্য। শরীর ভালো না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না। এই জানলাটা দিয়ে সামনের ঝাঁকড়া চুলের গাছটার সবুজ সতেজ বাহার দেখতে বেশ লাগে। এই গাছটায় সকালে নানারকম পাখি আসে। আপনমনে কিচিরমিচির করে চলে। সকালে অফিস থাকে বলে ব্যাস্ততার কারণে দেখা হয় না। এখন অখন্ড অবসর তাই জানলা দিয়ে রায়না দেখছে আর ওদের কিচিরমিচির শুনছে। দীপ দু'মাস হলো অফিস থেকে বদলি নিয়ে রায়পুর গেছে। এখন এই সাতশো স্কোয়ার ফিটের ঘরে রায়না পুরো একা। আবার মাথাটা টলে গেল। রায়না টেবিল হাতড়ে থার্মোমিটার নিয়ে দেখলো একশো দুই জ্বর। লতিকামাসির রান্নাঘর থেকে সিঙ্কে বাসন ধোয়ার আওয়াজ পেলো। ওর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে, নিজের মতো ঘরে ঢুকে রান্না করে বাসন মাজে। রায়না আওয়াজ পাচ্ছে কিন্তু ডাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

মোবাইল হাতড়ে দীপকে ফোন লাগিয়ে কথা বলতে পারলো না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। একটা চেনা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কেও জোরে ডোর বেল বাজাচ্ছে। জানলার বাইরে তখন বিকেলের রোদ ফুরিয়ে এসেছে। শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে। বাবা! কতক্ষণ ঘুমিয়েছে। লতিকামাসি রান্না করে টেবিলে গুছিয়ে চলে গেছে। বাইরের ডোর বেল তীব্র হচ্ছে। তাড়াতাড়ি মাস্ক পরে দরজা খুলে দেখে নামী ক্লিনিকের ব্যাচ লাগানো দুজন দাঁড়িয়ে।

দীপ খবর দিয়েছে, ওরা টেস্ট করতে এসেছে। রায়না ফাইল থেকে আঁধার কার্ড আনলো। চুকলো সোয়াব টেস্ট পর্ব। ওরা পেশাদারী ভঙ্গিতে জানালো রিপোর্টের সফট কপি বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে মোবাইলে চলে আসবে। রায়না দরজা বন্ধ করতেই দীপের ফোন, তারপর বাপী-মা। ফোন পর্ব সেরে রায়না মুখ ধুয়ে টেবিলে বসলো। খুব খিদে পেয়েছে। ক্যাসারোল খুলে দেখছে গরম ধোঁয়া ওঠা বিরিয়ানি। এটা লতিকামাসি খুব ভালো রাঁধে। কি গন্ধ ছাড়ে! গন্ধেই অর্ধেক ভাত হজম। কিন্তু রায়না গন্ধ পাচ্ছে না কেন? সন্দেহ হওয়াতে বিরিয়ানি মুখে দিল, কোন স্বাদ পেলো না। ফ্রিজ খুলে কাঁচা লঙ্কা বের করে কচকচ করে চিবোলো। না কোন ঝাল নেই। অথচ পরশু বাজার থেকে আনা লঙ্কাগুলোর বেশ ঝাল সেটা ও কালই খেতে গিয়ে বুঝেছে। খাবার ছেড়ে বাথরুমে ডেটলের বোতল খুলে শুঁকলো। না গন্ধ পাচ্ছে না। ভয়ের চোটে দৌড়ে ড্রেসিংটেবিল থেকে সুগন্ধি পারফিউম বার করে শুঁকলো। এবার রায়নার বুকটা ধড়াস

ধড়াস করতে লাগলো। তাহলে রিপোর্ট পজেটিভ আসবেই। জ্বরের সাথে সাথেই স্বাদ গন্ধ চলে গেছে। রায়না মনে মনে ভাবলো ছোট থেকেই বাপী বলতো মনটাতে নেগেটিভ কোন কিছুর বাসা বাঁধতে দিবি না। সব সময় মনে যেন পজেটিভিতে ভরা থাকে। রায়না সবসময় পজেটিভ মাইন্ডের। দীপকে ও কত বকুনি দিয়েছে নেগেটিভ কিছু ভাবার জন্য। কিন্তু কী অদ্ভুত আজ পৃথিবীর সব মানুষ তার রিপোর্টের দিয়ে তাকিয়ে আছে যেন নেগেটিভ আসে। পজেটিভ নয়। একই কথা কিন্তু সময় বিশেষে কত তারতম্য। দীপ আসতে চাইলে ও রায়না বারণ করলো কারণ ওর যদি রিপোর্ট পজেটিভ আসে তাহলে তো

দীপ ও রায়নার সাথে চৌদ্দ দিন বন্দি। তারপর আবার দীপের টেস্ট, নেগেটিভ এলে তবেই অফিসে জয়েন করতে পারবে। এত হ্যাপার চেয়ে রায়না একা ম্যানেজ করে নিতে পারবে। ফোন করে লতিকামাসিকে আসতে না করে দিল। শুধু ওর ছেলেকে হোয়াটসঅ্যাপে ওষুধ জিনিসপত্র যা যা লাগবে কিনে দরজায় ঝুলিয়ে দিতে বললো। ওর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেবে। বাকি অনলাইন ভরসা।

রিপোর্ট যথারীতি পজেটিভ। টেলিফোনে ডাক্তারের পরামর্শ মতো সব ওষুধ খাচ্ছে। হোম ডেলিভারি একটা মিলই শেষ করতে পারছে না । মুখে রুচি নেই। খুব দুর্বল। ইলেকট্রলটা পর্যন্ত জলে গুলে খেতে পারছে না। বন্ধু মেঘনা গাদা গাদা ফল হরলিক্স কিনে দরজায় ঝুলিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সেগুলো করে খাওয়ার শক্তি নেই।

রায়না আজ বিকেলে একটু জানলাটা খুলেছিলো কারণ এসি চালাতে পারছে না। তাই গুমোট গরম লাগছিলো। ফোনে সোসাইটি থেকে অবজেকশন জানালো জানলা খুলতে। পজেটিভ রোগীর জানলা খোলা থাকলে উল্টোদিকের মেসোমশাইদের অসুবিধা। রায়না তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিল। অথচ দিন পনেরো আগে এই মাসিমাদের বাড়ির বাজার ওষুধ অফিস থেকে ফেরার পথে করে এনে দিয়েছে। প্রায়ই করে দেয়। গ্যাস বুকিং থেকে প্লাম্বার ইলেকট্রিশিয়ান ডাকা সব রায়না আর দীপের দায়িত্ব। ছেলে কানাডায় থাকে, বুড়ো বুড়ি একলা। রায়নার বুকটা মুচড়ে উঠলো। রায়না খুব পজেটিভ স্পিরিট বলে মাসিমারা কত প্রশংসা করতো, আজ পজেটিভ পেশ্টেনের জানলা দিয়ে আসা হাওয়াও বিষ। রায়না নিজের মনকে নিজেই ধমকালো, ছিঃ ছিঃ কি ভাবছে! রোগটা তো সত্যি ভয়ের। আসলে একা থাকতে থাকতে ওর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। কোনো মানুষের মুখ দেখতে পারছে না। শুধু ডোরবেল শুনছে। খুলেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

শোন তোর কি সিম্পটম হয়েছিল রে? ইস একা আছিস? কি যে খারাপ লাগছে । কিন্তু এ এমন রোগ যে কেও যেতে পারবে না। জানিস তো আমাদের পাশের বাড়ির কুড়ি বছরের ছেলেটা আজ জ্বর হলো কাল শেষ! রায়না ফোনটা কেটে দিলো। এইরকম হাজার আত্মীয় প্রতিবেশীদের রায় শুনতে শুনতে ও ক্লান্ত। সব থেকে অবাক লাগে মানুষ একটা পজেটিভ

মানুষ কে কী করে এত এত নেগেটিভ খবর দেয়, বোঝে না যে পজেটিভ ভাইব্রেশনে তাড়াতাড়ি ওর রিপোর্ট নেগেটিভ আসবে। ফোনে, গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপে ও গাদা গাদা মৃত্যু সংবাদে ওর ফোন ভরে গেছে।

টুকটুক করে আওয়াজে চোখ খুলে দেখলো জানলার। ওপারে দেবু দাঁড়িয়ে। ওদের ফ্ল্যাটের সিকিউরিটি গার্ডের দশ-এগারো বছরের ছেলে। গতবছর লকডাউনের সময় থেকে ওর সাথে রায়নার ভাব। গতবছর তো দীপ আর রায়নার টানা ওয়ার্ক ফ্রম হোম ছিল। সেই সময় দেবু স্কুল ছুটি বলে বাবার সাথে আসতো। রায়না তখন ওকে ডেকে ঘরে বসিয়ে পড়াশোনা করাতো। ছেলেটার লেখাপড়ায় খুব মাথা। মাস্ক পরতো না। মাস্ক পরানো, হাত পা কীভাবে ধুতে হবে শেখানো সব রায়না শেখাতো। ওর বেশ সময় কাটতো। পুজোর সময় দেবুর পছন্দের জামা , জুতো, গেম সব কিনে দিয়েছিল। এখনো এখানে এলেই দেবুর রায়নার কাছে চকোলেট আইসক্রিম বাঁধা।

রায়না বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। সন্ধে হয়ে গেছে। ওপাশের নিয়নের আলোয় দেবুর মুখটা খুব অসহায় লাগছে। ও বোধহয় জেনে গেছে রায়না পজেটিভ। দেবু বন্ধ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ইশারায় বোঝাচ্ছে ও মাস্ক ঠিক মতো পরেছে। হাত পা নাড়িয়ে আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা করছে রায়না কাল ঠিক ভালো হয়ে যাবে। নানরকম অঙ্গভঙ্গি করে রায়নাকে হাসানোর চেষ্টা করছে। যেটা একসময় ওদের খেলা ছিল। রায়না এতদিনে প্রাণখুলে হাসলো। হঠাৎ দেবু পেছন ফিরে তাকালো, বাবা ডাকছে বোধহয়। বদ্ধ কাঁচের জানালার এপারে রায়না শুনতে পেলো না। দেবু ওকে টাটা করে দৌড়ে চলে গেল।

রায়নার মনটা আবার কালো অন্ধকার দিলো। ফোনে দীপ কলিং দেখেও ধরতে ইচ্ছে করছে না। বিছানায় এলিয়ে গেল। ভোর রাতে ওষুধের কল্যানে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তেই ঘুমিয়ে গেছিল। ঠকঠক! ঠকঠক! এবার আওয়াজটা জোরে এলো। চোখ খুলে দেখে জানলার ওপারে দেবু ঢিল দিয়ে ঠুকছে। পর্দা সরানো ছিল, তাই খাটে শুয়ে সরাসরি ওকে দেখা যাচ্ছিল। ওপাশে তখন কড়া রোদ। দেবু একগাল হেসে ইশারায় দেখালো বক্স জানলায় রাখা একগাদা নাম না জানা বাহারি ফুল আর তার পাশে রাখা একটা কাগজ।

দেবু চলে যাবার পর রায়না জানলা খুলে ফুল আর পাতলা ফিনফিনে খাতার পাতা ছেঁড়া কাগজটা নিয়ে দেখলো অপটু হাতে আঁকা একটা খোলা চুলের মেয়ে জানলা খুলে রয়েছে। নীচে পরিস্কার ইংরেজিতে লেখা পজেটিভ + পজেটিভ= নেগেটিভ

রায়না কাগজ হাতে চুপচুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু দেওয়ালে থাকা টিকটিকিটা ঠিকঠক করে উঠলো।

***

পাশ্চাত্যের সামাজিকতা বর্জন করতে হবে

মহঃ সামসুল হক

আমরা যদি পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করি, যেমন - উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশ, সেটাকে আরেক ভাবে বলা যায় পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের দেশ। পৃথিবীর দুই ধরনের দেশের মধ্যে কতকগুলো উদাহরণ তুলে ধরব তা যুক্তি সংগত কি না বলবেন।

আমরা কিন্তু অনুন্নত বা গরীব দেশ বা প্রাচ্যের দেশে বাস করি। আর আমেরিকা হল উন্নত বা ধনী বা পাশ্চাত্যের দেশ। আমরা গরীব দেশগুলো মনে করি, সেই সব উন্নত দেশের আধুনিকতা, কৃষ্টি কালচার, আচার-আচরণ সামাজীকতাকে অনুসরণ করলেই বুঝি আমরাও উন্নত হব, আমাদের দেশও উন্নত হবে। সত্যি কি তাই ? কিন্তু আমি মনে করি সবটাই সঠিক নয়। আমরাও মানুষ আমাদেরও ভাবতে হবে, কোন কোন জিনিসটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে আর কোন কোন জিনিসটা আমাদের বর্জন করতে হবে।

আমি মনে করি পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞান কে আমাদের গ্রহণ করতে হবে কারণ সারা বিশ্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আদান প্রদান সব যুগেই হয়ে আসছে, এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। কোনও এক দেশ বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কার করেছে, সেই সূত্রকে পূর্নতা দিয়েছে আরেক দেশ। এই ভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়ে চলেছে। কেউ বলেছেন পদার্থ ভেঙে অনু পরমানু, আবার কেউ ভেঙে করেছেন ইলেকট্রন,প্রোটোন, নিউট্রন।

কিন্তু আমরা এই গরীব দেশ যদি পাশ্চাত্যের সামাজিকতাকে অনুসরণ করি, মানি তবে আমাদের সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়বে বা ব্রেক ডাউন করবে।

দিন দিন পাশ্চাত্যের সামাজিকতা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও কিন্তু এখনও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য পাশ্চাত্য দেশগুলো থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে বা রক্ষনশীল। আমাদের প্রাচ্যের ধর্মগুলো যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ,জৈন, ইসলাম অনেকটা রক।

আমরা গভীর ভাবে ভাবিনা, একটা পরিবারের পিতা মাতার উপস্থিতিতে একজন সন্তান লালন পালন ভালো, না শুধু মাত্র একজন মায়ের কাছে লালন পালন হওয়া ভালো।

আরেকটা দিক হল যৌনমিলনের আইনি স্বীকৃতি হল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান সন্ততি লাভ করা। তবে কি সেই আইন বা সিস্টেম আমরা ভেঙে ফেলতে চলেছি?

যদি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পিতৃ পরিচয় না দিয়ে সন্তানের জন্ম দিই, অথবা বিজ্ঞানের সাহায্যে সন্তানের জন্ম দিই, তবে পুরুষেরা করবে কে? পুরুষেরা তো সন্তান প্রসব করতে পারবে না।

আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি এর ফলে সমাজ উন্নত তো হবেই না, উপরন্তু সমাজ ধংসের দিকে এগিয়ে যাবে। এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

উদ্ভিদ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। কিন্তু পারে আবার প্রাণী। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে কিন্তু পারে না। এই সব ব্যাতিক্রমী উদাহরণের উপর ভিত্তি করে সমাজ চলতে পারে না। আমি মনে করি এই সব পশ্চিমী কালচার আমাদের মতো গরীব দেশে বন্ধ হওয়া উচিত।নচেৎ আমাদের মতো গরীব দেশে পাশ্চাত্যের এই ফ্যাশান চালু হলে সমাজ পতনের দিকে ধাবিত হবে বলেই আমি মনে করি। আর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান পথেই পড়ে থাকবে।

আফ্রিকার দুই জন মানুষের মধ্যে এক জন এইডস আক্রান্ত।এই ফ্যাশান চালু হলে আমাদের দেশে এই মারণ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে তার ফলে স্বাস্থ্য ব্যাবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে।

পাশ্চাত্যে এই সব ঘটনার জন্য সম্পর্কের মধ্যে শ্রদ্ধা জিনিসটা উঠে গেছে। সেই কারণে সেই সব দেশে পিতৃ দিবস ঘটা করে পালন করার প্রচলন শুরু হয়েছে। সেই মাতৃ দিবস, পিতৃ দিবস উপলক্ষ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।এর থেকে লজ্জা ও অপমানের আর কিছু হতে পারে না। আমি ধিক্কার জানাই সেই সব দিবস পালন করা দেশ ও ব্যাক্তিদের। আমার কাছে প্রতিটা দিন থাকবে মাতৃদিবস ও পিতৃ দিবস।এর ফলে বাবা, মায়ের প্রতি অসম্মান জানানো হচ্ছে।

রক্ষনশীল সমাজ গঠনে, অনেকটাই সহায়ক।যা পিতা, মাতা গুরু জনদের শ্রদ্ধা করতে বা সম্মান জানাতে শিখিয়েছে।

পাশ্চাত্যের যৌন স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এক মহিলার একাধিক স্বামী, এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী হচ্ছে। যার ফলে সন্তান পিতা হারা হচ্ছে অথবা মা হারা হচ্ছে। কেউ শুধু পিতার পরিচয় পাচ্ছে, কেউ শুধু মাতার পরিচয় পাচ্ছে। তার ফলে সমাজে সেই সন্তান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ হতে গিয়ে, হীনমন্যতায় ভুগে এর ফলে তুলনা করে দেখবেন প্রাচ্যের থেকে পাশ্চাত্যে অনেক বেশি মানষিক বিকৃতি ঘটা মানুষের জন্ম দিচ্ছে।

এভাবে মাতা ও পিতার প্রতি সন্তানদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, মায়ামমতা, থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার ফলে দেশে জন্ম নিচ্ছে বৃদ্ধাশ্রম। ভাবা যায় অর্থের গরমে ছেলে ও বউমা শ্বশুর শাশুড়িকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে কুন্ঠাবোধ করে না। এটাও নাকি পশ্চিম দুনিয়া থেকে আসা আধুনিকতা। মনে করা হয় এটা উন্নত দেশের একটা কালচার। কিন্তু তখন তার ভাবা উচিত শ্বশুর শাশুড়িকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে, ছেলে মেয়ের জন্য স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে ছেলে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখন সে উপলব্ধি করে না, এই ছেলে মেয়ে তাকে এবং তার স্বামীকে একদিন বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসবে। যাকে সে এতো লালন পালন করছে। আমি অনুরোধ করছি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গ্রহণ করুন, তার সাথে সাথে তাদের এই নিম্ন সামাজিক কালচারকে পরিত্যাগ করুন।

***

দেবীদর্শন

শোভন সুন্দর দাস

ভোরবেলা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে ঘুমটা ভেঙে যায় তারকবাবুর। মহালয়া, আজ মহালয়া। মনটা খুশিতে ভরে যায়। সত্যি, আর সবকিছু পুরোনো হয়ে গেলেও মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে এই চণ্ডীপাঠ কোনোদিন পুরোনো হবার নয়। সেই কোন কিশোর বয়স থেকে শুনে আসছেন, কিন্তু প্রতিবারই নতুন লাগে। আসলে পুজো পুজো ভাবটা মনের মধ্যে ততক্ষণ যেন দানা বাঁধে না, যতক্ষণ না মহালয়ার ভোরে রেডিওতে এই আদি অকৃত্রিম কণ্ঠ ভেসে আসে। মনটা হারিয়ে যায় অতীতে, পুজোকে ঘিরে কত পুরোনো কথা, কত স্মৃতি। সব নতুন করে মনের মধ্যে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে। একটা ফেলে আসা আবেগ প্রতিবছরের মতো আবার নতুন করে এসে উপস্থিত হয়। নিজের অজান্তেই একটা হাসি খেলা করে যায় তারকবাবুর মুখমণ্ডলে। তিনি বিছানা থেকে উঠে খাটের সামনে রাখা ইজি চেয়ারটায় গিয়ে বসেন। চোখেমুখে জল পরে দিলেও চলবে, কোনও তাড়া তো নেই। আর তাড়া দেখিয়েই বা লাভ কী? তিনি তো শুনবেন। গত পাঁচ বছর ধরে শুধু শুনে যাওয়াই তো তাঁর কাজ। ফ্যাক্টরিতে ঘটা দুর্ঘটনায় নিজের দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর থেকে, যে অন্ধকারটা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল, তা আর কাটেনি, আর কাটবেও না কোনোদিন। ডাক্তার জানিয়েছিলেন, দুর্ঘটনার ফলে শুধু চোখের বাইরে নয়, ভিতরের অনেক সূক্ষ স্নায়ুরও ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা একপ্রকার অসম্ভব। অন্ধত্ব তাই এখন তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী। প্রথম প্রথম মানতে কষ্ট হত। এখন অসহায়তার সঙ্গে মনের সন্ধি হয়ে গেছে। তবে দুর্গাপুজোর কটা দিন এখনও খুব কষ্ট হয়, ক্ষোভটা ঠেলে ওঠে। মা দুর্গাকে মনে মনে অনুযোগ করেন, জিজ্ঞেস করেন, "কী দোষ করেছিলাম মা, কেন আমাকে এই শাস্তি দিলে। সবাই বলে তুমি পাপীদের শাস্তি দাও...আমার কী পাপ ছিল যে আমার দৃষ্টি থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলে...", আর বলতে পারেন না। চোখ জলে ভরে আসে। এইবারও মহালয়া শুনতে শুনতে সেই খেয়ালেই হারিয়ে গিয়েছিলেন, তাই কখন সুরঞ্জনা ঘরে ঢুকেছেন বুঝতে পারেননি।

"মুখ না ধুয়ে চুপ করে বসে আছো কেন, ধুয়ে এসো, চা এনেছি", সুরঞ্জনার গলায় সম্বিত ফেরে তারকবাবুর।

তিনি হেসে বলেন, "ওই মহালয়াটা শেষ হবার জন্য বসেছিলাম।"

সুরঞ্জনা চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে বিছানাপত্র গোছাতে শুরু করেন। তারকবাবু ততক্ষণে বাথরুম থেকে ফিরে এসে ফের চেয়ারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দেন।

"সুরেশ কবে আসবে কিছু বলেছে নাকি?" জিজ্ঞেস করেন তারকবাবু।

"হ্যাঁ, ফোন করেছিল, ষষ্ঠীর দিন সকালবেলা চলে আসবে বলেছে।" উত্তর দেন সুরঞ্জনা।

"যাক, আগেরবারের মতো অন্তত পুজোটা একা একা কাটাতে হবে না।" মৃদু হেসে বলেন তারকবাবু। কথাটা অবশ্য সর্বৈব সত্যি নয়, কারণ স্ত্রী সুরঞ্জনা সর্বক্ষণ তারকবাবুর পাশেই থাকেন, তাঁর দেখাশোনা করেন, তাই তিনি একা কখনোই নন, কিন্তু তাঁদের নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনের যে একাকিত্ব সেটা একমাত্র পূরণ করে তাঁর ভাই সুরেশের আট বছরের মেয়ে দিশা। তাই পুজোর দিনগুলোতে দিশা বাড়িতে না থাকলে তাঁদের কারোরই ভালো লাগে না। সুরেশ কলকাতায় থাকে না, বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ওখানেই থাকে। খালি বছরে দুবার ছুটি নিয়ে কলকাতায় সপরিবারে কাটিয়ে যায়। তবে আগেরবার সুরেশের শাশুড়ি মারা যাওয়ার ফলে আগেই ছুটি নিয়ে নেওয়ায় পুজোর সময় আর আসতে পারেনি। তাই গোটা পুজোটা তারকবাবু আর সুরঞ্জনাকে বলতে গেলে একলাই কাটাতে হয়েছে।

সুরঞ্জনা হেসে বললেন, "সে আর বলতে, আমিতো দিন গুনছি, কবে ষষ্ঠীর সকালটা হবে।"

অপেক্ষাটা খুব একটা বেশিদিনের নয়। মহালয়ার থেকে ষষ্ঠীর তফাত খালি ছয়দিনের, কিন্তু সেই ছয়দিনের অপেক্ষাই দুজনের কাছে যেন অসহনীয় হয়ে ওঠে। একেকটা দিন যেন একেক বছরের মতো লম্বা, কিছুতেই ফুরোতে চায় না। সুরঞ্জনা অবশ্য সংসারের অন্য কাজ থাকায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখার সুযোগ পান, যেটা তারকবাবুর অদৃষ্টে নেই। তাই তাঁর পক্ষে অপেক্ষাটা আরও অধৈর্যের। তবে শেষমেশ অপেক্ষার অবসান হয়। ষষ্ঠীর দিন সকালে ঢাকের শব্দে ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই সদর দরজার কলিংবেলের কাঙ্ক্ষিত শব্দটা কানে আসে। বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে বসে কান খাঁড়া করে শোনেন তারকবাবু। হ্যাঁ, সুরেশের গলা, সঙ্গে দিপালি আর...আর সেই চেনা মিষ্টি গলাটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই মিষ্টি গলাটা ঝড়ের গতিতে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে একটা "জেঠুমণি" চিৎকার ও হাসির সঙ্গে তাঁর বুকে আছড়ে পড়ে। মনটা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় তারকবাবুর। দিশাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "আরে আমার দিশামা এসে গেছে তো। আর চিন্তা নেই, এইবার পুজোটা পুজোর মতো হবে।"

দিশার মিষ্টি কোমল স্বর ভেসে আসে, "সেতো হবেই। আমি বাবাইকে বলে রেখেছি, আমাকে টেনখানা ঠাকুর দেখাতেই হবে। নইলে বাবাইয়ের সঙ্গে আড়ি করে দেব।"

"সেতো দেখাতেই হবে...নইলে আমিও তোর বাবাইয়ের সঙ্গে আড়ি করে দেব", হেসে বলেন তারকবাবু। সুরেশ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হেসে বলে, "কাউকেই আড়ি করতে হবে না...দশটা কেন, আমি তোকে বিশটা ঠাকুর দেখাব।"

দিপালিও হেসে যোগ করে, "উফ্ এই একমাস ধরে খালি জেঠুমণি আর মামণির কাছে কবে যাব প্রশ্ন করে করে পাগল করে দিয়েছে একেবারে।"

দুজনেই তারকবাবুকে প্রণাম করে। সুরেশ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছো দাদা? শরীর ঠিক আছে তো? বৌদি বলছিল তোমার সুগারটা নাকি মাঝখানে বেড়েছিল..."

"আরে রাখ্ তোর সুগার, তোর বৌদির তিলকে তাল করা স্বভাব...আমার কিছুই হয়নি...একদম ফিট", তারপর দিশাকে ভালো করে জড়িয়ে ধরে হেসে বলেন, "আর এখনতো ডবল ফিট। আমার ওষুধতো আমার সামনেই রয়েছে।"

সুরঞ্জনা কপট রাগে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ একেবারে ফিট...আমার তিলকে তাল করা স্বভাব...বলি যখন গা ঝিম ঝিম করছে বলে মিনমিন করো তখন মনে থাকে না?"

"তুমি কিন্তু জেঠুমণিকে একদম বকবে না মামণি...আমি কিন্তু তাহলে তোমার সাথে আড়ি করে দেব।" দিশার প্রতিবাদ ভেসে আসে। সবাই সে কথায় হেসে ওঠে। দিপালি বলে, "ওহে জেঠুমণির উকিল...চলো এবার হাত-পা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নেবে।"

দুপুরবেলাটা তারকবাবুর দিশার সঙ্গে গল্প করেই কেটে যায়। দিশা তাঁকে তার স্কুলের বিভিন্ন ঘটনা শোনায়। তারকবাবু খুব আগ্রহ নিয়ে শোনেন এবং বিনিময়ে নিজের ছোটবেলার বিভিন্ন মজার ঘটনা শোনান। হাসির আওয়াজে বাড়িটা গমগম করতে থাকে। সেদিন সন্ধ্যায় সবাই ঠাকুর দেখতে বের হয়, তবে তারকবাবু ও সুরঞ্জনা বাদে। দিশা যদিও তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু রাজি হওয়ার উপায় তো নেই। একটা ম্লান হাসি হেসে তারকবাবু বলেছিলেন, "আমি গিয়ে কী করব বলতো মা, ঠাকুরকে দেখতে তো পাব না। আর আমাকে নিয়ে ওই ভিড়ের মধ্যে তোরা হাঁটবি কী করে? তোরা বরঞ্চ মামনিকে নিয়ে যা...", সুরঞ্জনা প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন, "না বাবা ওই ভিড়ে আর চাপাচাপির মধ্যে আমার দম আটকে আসে...আমি বরঞ্চ টিভিতে ঠাকুর দেখে নেব...তোরা যা।" তারকবাবু চুপ করে থাকেন। তিনি ভালো মতোই জানেন যে অজুহাতটা একেবারেই সত্যি নয়, কারণ যখন তারকবাবুর দৃষ্টি ছিল তখন পুজোয় ঠাকুর দেখার আগ্রহ তাঁর থেকে সুরঞ্জনার অনেক বেশি ছিল। সারারাত ঠাকুর না দেখলে মন শান্ত হত না। তিনি যেতে পারছেন না বলেই যে সুরঞ্জনা যাচ্ছেন না সেটা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয় না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে তাঁর অন্তর থেকে। দিশা অবশ্য এইসব কথা শোনার পাত্রী নয়। অনেক জেদ করেছিল সে কিন্তু তারকবাবু নিরুপায়। তিনি একপ্রকার জোর করেই তাকে ঠাকুর দেখতে পাঠান। মুখে হাসি ধরে রাখলেও মা দুর্গার প্রতি মনের সেই পুরোনো ক্ষোভটা বেড়ে ওঠে। সেদিনের মতো ব্যাপারটা মিটে যায়। শিশুর কৌতূহলের কাছে হার মানে দিশার ব্যাজার মনও। সে অগত্যা টেনখানা ঠাকুর দেখতে চলে যায়।

পরদিন সকালবেলা তারকবাবু যখন নিজের ঘরে বসে রেডিও শুনছেন তখন দিশা দৌড়ে ঘরে ঢোকে, উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে। তারকবাবু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করেন, "কী হয়েছে রে মা… এতো হাঁপাচ্ছিস কেন?"

দিশা উত্তেজিত স্বরে বলে, "জেঠুমণি আমি ঠাকুর হব।"

"ঠাকুর হবি মানে?" একটা হাসি তারকবাবুর ঠোঁটের কোনে দেখা দেয়।

"ওইতো কারা যেন এসেছিল, বাবাইকে বলল, আমাকে নাকি কালকে ঠাকুর বানাবে। কি ঠাকুর জেঠুমণি? দুর্গা ঠাকুর?"

তারকবাবু আন্দাজ করলেন যে দিশা অষ্টমীর কুমারী পূজার কথা বলছে। তিনি হেসে বললেন, "হ্যাঁ মা…দুর্গা ঠাকুর। আরে সেতো খুব ভালো কথা। আমার দিশামা দুর্গা ঠাকুর হবে এতো খুব

আনন্দের কথা...দেখি আমার দিশামার মুখখানা...", বলে তিনি তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার কপালে একটা চুমু খেলেন। দিশা একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, " জেঠুমণি তুমি দেখতে পাও?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে তারকবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে যান। তবে ব্যাপারটা বুঝতে বেশি দেরী হয় না। তিনি যে দেখার কথা বলেছেন তার মানে এইটুকু ছোট মেয়ে বুঝতে পারেনি। তিনি হালকা হেসে বলেন, "না মা আমি দেখতে পাই না।"

"তবে যে বললে দেখি আমার দিশামার মুখখানা?"

তারকবাবু এবার স্নেহের সুরে বলেন, "সেতো ছুঁয়ে দেখা মা...মা দুর্গা আমাকে দেখতে বারণ করেছেন বলে কী আমি দেখব না..." একটু চুপ করেন তারপর হেসে বলেন, "আমি তাই ছুঁয়ে দেখি...এই যেমন তোমাকে ছুঁয়ে বলে দিতে পারি যে দিশামাকে আমার একেবারে রাজকন্যার মতো দেখাচ্ছে।"

দিশা হেসে ওঠে, "সেতো তুমি সব সময় বলো।"

"দেখতে পাই বলেই তো বলি।"

সুরঞ্জনা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করেন, "কী দেখার কথা হচ্ছে?"

"দেখো না মামণি…জেঠুমণি বলছে যে জেঠুমণি নাকি সব কিছু ছুঁয়ে দেখতে পায়।"

সুরঞ্জনার মুখে একটা মলিন হাসি ফুটে ওঠে। তিনি কিছু বলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কিন্তু এই কথাটা নিয়েই আবার গণ্ডগোল শুরু হয়। দিশা আবার জেদ ধরে বসে যে সে তার জেঠুমণি আর মামনি ছাড়া ঠাকুর দেখতে যাবে না। তাকে সবাই মিলে বোঝানোর অনেক চেষ্টা হয় কিন্তু সে কিছুতেই মানতে চায় না। তার বক্তব্য হল জেঠুমণি নিজে তাকে বলেছে যে সে ছুঁয়ে সবকিছু দেখে, তাই ঠাকুর না হয় জেঠুমণি ছুঁয়েই দেখবে। তারকবাবুকে অনেক কষ্টে বোঝাতে হয় যে প্যান্ডেলে গিয়ে ঠাকুরের গায়ে হাত দিতে দেবে না। আর না ছুঁলে তিনি দেখবেন কী করে? তাই তিনি ঠাকুর দেখতে যেতে পারবেন না। অনেক বোঝানোর পরে দিশা চুপ করে, তবে মামণিকে সে আজ নিয়ে যাবেই। সুরঞ্জনা অনেকবার মানা করেন, কিন্তু এবার সুরেশ ও দিপালিও জোর করতে থাকে। তারকবাবু নিজেও বলেন, "আরে যাও না...দেখে এস। দু-তিন ঘণ্টার তো ব্যাপার। আমি তো আর কোথাও যাচ্ছি না...এইখানেই বসে থাকব।"

অনেকবার বলার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুরঞ্জনা রাজি হন।

সবাই ঠাকুর দেখতে বেড়িয়ে যাওয়ার পর তারকবাবু একলা তার ইজি চেয়ারটাতে বসে রেডিও শুনতে শুনতে নিজের খেয়ালে হারিয়ে যান। মনে পড়ে যায় ছোটোবেলার সেইসব দিন, বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে ঠাকুর দেখার স্মৃতি। কত হাসি, কত মজা, কত বিস্ময়। বিয়ের পর সুরঞ্জনাকে নিয়ে পুজায় বেড়ানোর মুহূর্তগুলো। দুর্ঘটনাটা ঘটার আগে দুবছরের দিশাকে কোলে নিয়ে

কাছের পাড়ার ঠাকুরগুলো দেখিয়ে আনা…কি সব সময় গেছে। মনে পড়লে মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

রাতের দিকে সবাই যখন ফিরে আসে তখন তারকবাবু রেডিও শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়াল নেই। সুরঞ্জনার ডাকে ঘুম ভাঙে। তিনি একটু ইতস্ততঃ করে বলেন, "রেডিওতে যা সুন্দর গান বাজছিল, শুনতে শুনতে কখন যে চোখ লেগে গেছে কে জানে..." তারপর একটু থেমে বলেন, "দিশা কোথায়?"

ঘুমিয়ে পড়েছে...বাচ্চা মানুষ...ছোটাছুটি করে ঠাকুর দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছে...আর তাছাড়া কাল আবার সকালে উঠে কুমারী পূজায় যাবে তো।"

"তা ঠিক...", তারকবাবু আর কিছু বলেন না।

সুরঞ্জনা এগিয়ে এসে তারকবাবুর কাঁধে হাত রেখে একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলেন, "হ্যাঁগো...আমি যে আজ তোমাকে ছাড়া গেলাম...তোমার কোনও অসুবিধা হয়নি তো? আমার কিন্তু একদমই যাবার ইচ্ছা ছিলনা..."

তারকবাবু তাড়াতাড়ি হেসে উত্তর দেন, "আরে না না অসুবিধা হবে কেন...আমি তো দিব্যি গান শুনে সময় কাটালাম...", তারপর সুরঞ্জনার হাতের ওপর আলতো করে নিজের হাতটা রেখে বলেন, "দ্যাখো...মা আমাকে দর্শন থেকে বঞ্চিত করেছেন...হয়তো আমার কোনও পূর্বজন্মের পাপ ছিল যার জন্য তিনি এই শাস্তি দিয়েছেন...কিন্তু আমার জন্য তুমি তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত হও সেটাতো আমি চাই না..."

সুরঞ্জনার চোখের কোণে জল চিকচিক করে ওঠে। তারকবাবু দেখতে না পেলেও সেটা অনুভব করতে পারেন। তিনি সান্ত্বনার সুরে বলেন, "মন খারাপ কোরো না"। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকেন। অবশেষে তারকবাবুই নীরবতা ভাঙেন। ব্যস্ততার সুরে বলেন, "আচ্ছা খাবার-দাবার কী আনলে তাড়াতাড়ি দাও, আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।"

সুরঞ্জনা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখমুছে বলেন, "ওই দেখো একদম ভুলে গেছি...বিরিয়ানি আনা হয়েছে...দাঁড়াও বেড়ে দি", বলে ঘর থেকে বেড়িয়ে যান।

পরদিন সকালে তারকবাবুর একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙল। আগের দিন অসময় ঘুমিয়ে পড়ার ফলে ঘুম এসেছে অনেক রাতের দিকে। তাই সকাল সাতটায় আর সেটা ভাঙেনি। যখন ভেঙেছে তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। তিনি উঠে চোখমুখ ধুয়ে চেয়ারে এসে বসার পর সুরঞ্জনা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারকবাবু তাঁর হাত থেকে কাপটা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলেন, "দিশা কোথায়?"

সুরঞ্জনা হেসে বললেন, "সেতো আটটার সময় প্যান্ডেলে চলে গেছে। সেজেগুজে জেঠুমণিকে দেখাতে এসেছিল কিন্তু তুমি ঘুমোচ্ছো দেখে আর ডাকেনি।"

তারকবাবু কিছু বললেন না, চুপচাপ চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

প্রায় দশটার সময় দরাজায় কলিংবেলের আওয়াজে তাঁর কান খাড়া হয়ে উঠল, শুনে বুঝলেন দিশার গলা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই গলার অধিকারিণী দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকল।

তারকবাবু হাসিমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই দিশা বলে উঠল, "জেঠুমণি ঠাকুর দেখবে?"

হঠাৎ এই প্রশ্নে তারকবাবু প্রথমে কিছু বলতে পারলেন না। প্রশ্নটা ধীরে ধীরে তাঁর কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তিনি মলিন হেসে বললেন, "তোমাকে তো বললাম মা,

আমাকে ঠাকুরের গায়ে হাত দিতে দেবে না..." তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই দিশা বলে উঠল, "নাগো জেঠুমণি তোমাকে প্যান্ডেলে যেতে হবে না, তুমি আমাকে ছুঁয়েই দেখতে পারবে। আমিও তো এখন ঠাকুর হয়েছি।"

দিশার এই সহজ সরল কথাটা তারকবাবুকে বাকরুদ্ধ করে দিল। তিনি কোনও কথা বলতে পারলেন না। অন্ধ দুই চোখের কোণায় জল চিকচিক করে উঠল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে তিনি দিশাকে কাছে টেনে নিলেন। ধরা গলায় বললেন, "ঠিকই তো মা, আমার তো মনেই ছিল না যে আমার দিশামা নিজেই আজ মা দুর্গা হয়ে এসেছে..." বলে তিনি দিশার মুখটা নিজের হাতের স্পর্শে অনুভব করতে করতে বললেন, "বাঃ মাকে আমার খুব সুন্দর দেখাচ্ছে...যেরকম চোখ থাকতে দেখেছিলাম ঠিক সেইরকম..."

মনে মনে তিনি দুর্গা ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, "ধন্য মা তুমি...আমার দুঃখের এই রকম প্রতিকার আমি আশা করিনি। পূর্বজন্মে কোনো পুণ্য ছিল হয়তো তাই মেয়ের রূপে আজ আমায় দর্শন দিলে...আজ আমার সত্যিকারের দেবীদর্শন হল মা।"

***

মাতলা

দেবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামে দিনের আলোয় যার ছায়া মাড়ানো আপনার ধর্মে নিষিদ্ধ, আর রাতের গভীরে যাকে বস্তি থেকে তুলে আনতে পাইক বরকন্দাজ পাঠান আপনি আর সুসজ্জিত বিছানায় যার জন্য অপেক্ষায় অধীর হয় আপনার রাজকীয় লাম্পট্য, আমিই সেই মেয়ে।

আমিই সেই মেয়ে- এমন কি দেবতারাও যাকে ক্ষমা করেন না। অহংকার আর শক্তির দম্ভে যার গর্ভে রেখে যান কুমারীর অপমান আর চোখের জলে কুন্তী হয়ে নদীর জলে

বিসর্জন দিতে হয় কর্ণকে। আত্মজকে।

আমিই সেই মেয়ে।

নয়ন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, কবি শুভ দাশগুপ্তের লেখা কবিতার লাইন গুলি আবৃত্তি করে চলেছে। তার দৃষ্টি জানলার বাইরে। আজ অমাবস্যার রাত। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পৃথিবী আজ যেন, কোনো মায়ার খেলায় মেতেছে। পাশের ঘর থেকে, শেফালির চিৎকার শোনা যাচ্ছে বার বার। সহ্য করতে না পারা যন্ত্রণার চিৎকার। এতক্ষণে হয়তো তার বিছানাটা ভিজে গেছে, পা বেয়ে ঝরে পড়া রক্তে। মেয়েটা বোধ হয় আর বাঁচলো না। কিন্তু ওরা যে মেয়েটাকে, মরতেও দেবেনা। নয়নের, দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আচমকা মাধবের গলা শুনে, নয়ন চমকে উঠল। 'তোকে বহুত বার বারন করেছিলাম। করেছিলাম কি না? বল? নে, এবার ভোগ।' নয়ন কাঁদতে কাঁদতে জানালার সিক ধরে বসে পড়ল।

মাতলা নদীর ধারে, নিতাই-এর পৈত্রিক ভিটে। মাটির ঘর, গোয়াল ঘর, ধানের গোলা, ধানি জমি, সবই ছিল। কিন্তু আজ তা অতীত। কারণ, কিছু খেয়েছে মাতলা নদী, আর কিছু খেয়েছে মহাজন। এখন নিতাই, অন্যের জমিতে, খেত মজুরের কাজ করে। যা রোজগার হয়, তা দিয়ে একটা পেট চালানোই খুব কষ্টের। দুটো পেট তো, নৈব নৈব চ। কিন্তু, দোলন মেয়েটি খুব লক্ষ্মী। ফুল শয্যার রাতে, নিতাই যখন দোলনের ঘোমটা খুলে দিয়ে, তার পাশে বসে বলেছিল, 'বৌ , আজ থেকে তুই, এই বাড়ির লক্ষ্মী। আমার তো, নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তুই কিন্তু একটু সামলে নিস... কেমন...'। তখন দোলন, লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে ছিল। বর্ষাকালে খরের চাল থেকে জল পড়লেও, মাটির দেওয়াল থেকে মাটি খসে পড়লেও, নিতাই দোলন এর সংসার বেঁধে উঠেছিল, গভীর ভালবাসার বাঁধনে। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায়, এক মাথা ঘোমটা টেনে ,

তুলসি মণ্ডপে প্রদীপ দেখাতে দেখাতে, দোলন আড়চোখে তাকাতো রাস্তার দিকে। দেখতে পেতো, দূরে আল পার হয়ে, নিতাই দৌঁড়তে দৌঁড়তে বাড়ি ফিরছে। এটাই, নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিনত হয়েছিল দোলনের।

কিন্তু আজ সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরেও যখন নিতাই বাড়ি ফিরল না, তখন দোলনের মন, অস্থির হয়ে ওঠে। পুজোর থালা দাওয়ায় উপর রেখে, রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। এদিকে সময় কিন্তু বয়ে চলে, তার নিজের গতিতে। নিতাই এর কোনো দেখা নেই। ক্রমে দোলনের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। মনের মধ্যে অজানা ভয় বাসা বাঁধে। চার পাশের গাঢ় অন্ধকার আজ যেন, তাকেই কেন্দ্র করে ঘনীভূত হচ্ছে। দোলনের পা এবার কাঁপতে শুরু করেছে। মাটিতে বসে পড়ল সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, তারায় গিজ্‌গিজ্‌ করছে আকাশ। হঠাৎ, দূরে মাঠের উপর থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে, তার দিকে। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যায় না। কিন্তু মানুষটার হাঁটাচলা স্বাভাবিক নয়। কোনোমতে উঠে দাঁড়াল দোলন। মাতলা নদী থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে, উড়িয়ে দিল তার ঘোমটা। ছায়া মূর্তি এতক্ষণে তার অনেকটা কাছে চলে এসেছে। কে এটা? এতো নিতাই। একি অবস্থা তার? জামা কাপড় ছেঁড়া, সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। নিতাই দোলনকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে বসে পড়ে। দোলন অস্থির হয়ে বলে ওঠে, 'একি হলো গো তোমার? এ অবস্থা কি করে হল?' নিতাই অতি কষ্টে মুখে একটু হাসি এনে বলে, 'বিশ্বাস বাবুর কাছে, বকেয়া টাকা চেয়েছিলাম। শুনে তিনি বললেন,

বিশ্বাস – ওরে শোন, বেটা কি বলে... বেটার নাকি, বকেয়া টাকা চাই। কোন আমার সুদখোর এল রে। তা বলি টাকা নিয়ে কি করবি রে হারামজাদা?

নিতাই – বৌ টা পোয়াতি ববাব। ঠিক মতো, দু বেলা দু মুঠো খাওয়ার দিতে পারিনে। ঘরটাও ভেঙে পড়তেছে। বাদলার দিন এসে গেছে বাবু। ঘরটা একটু ঠিক না করলে, এবার যে ঘর চাপা পড়ে মরব।

বিশ্বাস – ভালই তো হবে, পৃথিবীর ভার একটু কমবে। যা যা... মেলা বকিস না। ওই তো কাজের ছিরি। এক ঘণ্টা মাটি কোপাস তো, আধ ঘণ্টা মাথা ধরে বসে থাকিস।

নিতাই – কি করব বাবু? পেটে বড়ো খিদে গো। মাথা ঘুরিয়ে যায়। কলমি শাক আর ভাত খেয়ে, কত দিন থাকা যায় বলেন?

বিশ্বাস – তা এতই যখন অভাব, তখন মনে এতো রস আসে কোত্থেকে শুনি?

নিতাই – বাবু, বাজে কথা বলবেন না। হকের টাকা চাইছি। ভিক্ষা চাইছি না?

বিশ্বাস – কি... যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা? ওরে··· তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দে হারামজাদাকে।

বিশ্বাস বাবুর পোষা গুন্ডা গুলো খুব মার মেরেছেরে বৌ’ । নিতাই দোলনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। দোলনের চোখেও জল।

সেই রাতটা, দোলনের কাছে ছিল আতঙ্কের রাত। দিনের আলো আর, ফুটতেই চাইছে না। এদিকে যন্ত্রনায় ছটফট করছে নিতাই। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। মাথার কাছে বসে দোলন জলপট্টি দিচ্ছে বার বার। আর মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে চলেছে সে।

সেই রাত, আরও বিভীষিকাময় হয়ে উঠল, যখন প্রবল বেগে ঝড় আর বৃষ্টি আছড়ে পড়ল সুন্দরবনের উপর। মাতলা নদী, আরও মাতাল হয়ে উঠল। নদীর বাঁধ ভেঙে, জল ঢুকতে শুরু করল, দু পাড়ে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে, বাঁচার চেষ্টা করতে লাগল, পোয়াতি দোলন। কখনো বা পা পিছলে পড়ে যায়, আবার কখনও জলের স্রোত এসে আছড়ে পড়ে তাদের উপর। বারবার উঠে দাঁড়াই দোলন। নিতাইকে তুলে ধরে। গায়ে গাছের ডাল লেগে, ছিন্নভিন্ন হতে থাকে ওদের শরীর। তবুও সে থামে না। স্বামীকে, পেটের শিশুটাকে, বাঁচাতেই হবে দোলনকে। দীর্ঘ চার ঘণ্টা লড়াই করে, নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছায় তারা। দিনের আলো তখন সবে ফুটছে। দোলনের অদম্য জেদের কাছে, প্রকৃতিও আজ হার মানল। কিন্তু সত্যি কি তাই? স্বামীকে সে বাঁচাতে পারল ঠিকই, কিন্তু পেটের শিশুটাকে দোলন বাঁচাতে পারল না। উঁচু জমিতে, প্রানে বাঁচা মানুষগুলির মাঝে, এখন চিত হয়ে শুয়ে আছে নিতাই ও দোলন। দোলনের শাড়ি, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। পা বেয়ে গড়িয়ে পড়া গাঢ় লাল রক্তে।

এরপর বেশ কয়েক দিন কাটল। সরকার বলেছিল, এই ঝড়ের নাম ‘আয়লা’ । সুন্দর নাম... তাই না? যাই হোক... জলের স্তর নামলে বোঝা গেল, নিতাই দোলনের সংসারের, আরও বেশ কিছুটা অংশ গ্রাস করেছে মাতলা নদী। এদিকে, সেই রাতের পর থেকেই, নিতাই বিছানায় শয্যাশায়ী। কর্মক্ষমতা হারিয়েছে সে। বাধ্য হয়ে দোলনকে, দুটো বাড়িতে, ঘর মোছা, বাসন মাজার কাজ নিতে হয়। এরই মধ্যে, একদিন তাঁদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়, নিতাই-এর দূর সম্পর্কের পিসি আর পিসতোত ভাই, সুরেশ। এসেই পিসি দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে নিতাই এর বিছানার পাশে আছড়ে পরে, বুক চাপড়ে কাঁদতে থথাকলে।

পিসি – এও আমায় দেখতে হল গো··· ভগবান, এ তোমার কি নিষ্ঠুর খেলা··· আমি বেঁচে থাকতে আমার নিতাইকে তুমি এতো কষ্ট দিচ্ছ কেন ভগবান?

নিতাই – কেঁদোনা পিসি।

পিসি –কাঁদি কি সাধ করে রে? উপরওয়ালা আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে, এই সব দেখার জন্য?

দোলন মাথায় ঘোমটা দিয়ে, দাঁড়িয়ে ছিল দুয়ারের বাইরে। সুরেশ তাকে দেখে বলল..

সুরেশ – আমি তো কোনো খবরই পাইনি... মা যখন আমায় জানাল, আমি কলকাতা থেকে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে এলাম।

পিসি – আহারে, আমার বৌমার চাঁদপানা মুখটা, এক্কেবারে শুকিয়ে গেছে গো। তুই চিন্তা করিস না বৌ। আমরা যখন এসে গেছি, তখন তোদের আর চিন্তা করতে হবে না।

হয়তো এই কথাটা শুনে, নিতাই আর দোলনের মনে কিছুটা সাহস জন্মেছিল। কিন্তু ভুল ভাঙল অচিরেই। কিছু দিন পরে, পিসি নতুন রুপে ধরা দিল তাঁদের কাছে। সেদিন দোলন, কাজে বেরিয়েছিল। সেই সময় পিসি এসে নিতাইকে বলল

পিসি – শোন বাবা নিতাই, বৌটা তোর সংসারের লক্ষ্মী নয় রে। দেখছিস না, বিয়ের পর থেকে, তোর কোনও উন্নতি হয়নি। এমনকি আজ অবধি, একটা বাচ্চা পর্যন্ত দিতে পারল না। বৌটাকে এবার বিদায় করে, নতুন বৌ ঘরে আন।

নিতাই – এ সব কি বলছ পিসি ?

পিসি – যা বলছি, একদম ঠিক বলছি। না হলে তোর এমন অবস্থা হয়? দিনে দিনে, ছেলেটা চোখের সামনে শুকিয়ে যাচ্ছে গো। আমার মনে হয় কি জানিস? তোর বৌ, কাজের নাম করে, অন্য কোথাও যায়। পাপ পাপ। পাপ বাপ কেও ছাড়ে না। আর সেই পাপ এসে লাগছে, তোর গায়ে।

নিতাই – না পিসি। দোলন তেমন মেয়ে নয় গো।

পিসি – থাম তো তুই। আমি সব বুঝি। আরে বাবা, আমিও তো একটা মেয়ে, নাকি? ওর চোখ দেখেই আমি বুঝতে পারি। ভেবেছে আমায় ফাঁকি দেবে। শোন বাবা, বউয়ের ওই বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ গুলো, বন্ধ করতে হবে।

নিতাই – কিন্তু কাজ বন্ধ করলে, আমরা খাব কি পিসি? তোমাদের মুখেই বা কি তুলে দেব?

পিসি – থাম তো। ওই তো তদের খাওয়া। ভাত আর শাক, শাক আর ভাত। শোন, সুরেশ তোর বউয়ের জন্য, একটা কাজের খবর এনেছে। কোলকাতায় কাজ। শুরুতে ২০০০ টাকা দেবে। থাকা, খাওয়া, সব দেবে। প্রতি মাসের মাইনেও ভালো। দেখ, তোর বৌ করে কিনা? না করলেই বুঝবি, ওর অন্য কোথাও লটর-পটর আছে।

পুরুষ মানুষেরা, যদি দীর্ঘদিন কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে বাড়িতে বসে থাকে, তাহলে হয়তো তাঁদের চিন্তা শক্তি হ্রাস পায়। অন্তত নিতাই এর সঙ্গে তাই হল। পিসির কুমন্ত্রনায়, নিতাই ভুলে গেল দোলনের ভালবাসা। সেই রাতে কাজ থেকে ফিরে, দোলন যখন নিতাই এর ভাত বেড়ে নিয়ে গেল, খাইয়ে দেওয়ার জন্য, নিতাই হাত দিয়ে ঠেলে ভাতের থালা ফেলে দিল। নিতাই বলল, ‘আজ কাল দেখছি, রোজই তোর ফিরতে দেরি হচ্ছে। এতো রাত অবধি কি করিস তুই?’ দোলন

কিছু বুঝতে পারল না। চুপ করে থাকল সে। নিতাই এবার চিৎকার করে উঠল। ‘কিরে চুপ করে আছিস যে বড়ো। উত্তর দে’। দোলন মৃদু স্বরে বলল ‘দত্তদের বাড়িতে বসে থাকি, কখন ওদের খাওয়া শেষ হবে তার জন্য। জানো দত্তদের বৌ খুব ভালো। ওদের খাওয়ার পর যা ভাত বাচে , আমাকে দিয়ে দেয়’। নিতাইয়ের কানে, দোলনের কোনো কথাই পৌঁছালো না। সে বলতে থাকল, ‘শোন বৌ, কাল থেকে দত্তদের বাড়িতে তুই কাজে যাবি না। সুরেশ তোর জন্য, কোলকাতায় একটা কাজ ঠিক করেছে। ভালো কাজ।’ দোলন শাড়ির আঁচলটা আঙ্গুলে পেঁচাতে পেঁচাতে , মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ আমি চলে গেলে তোমায় দেখবে কে? তোমাকে খাইয়ে দেবে কে? স্নান করিয়ে দেবে কে গো?’। তারপর নিতাই এর পাশে গিয়ে বসে বলল, ‘আমি যাবনা গো। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না’ । এই কথা শুনে নিতাই, তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, ‘তা যাবি কেন? গেলে তো তোর ফসটি- নসটি সব বন্ধ হয়ে যাবে। শালা কোথায় একটু

খেয়ে পড়ে বাঁচব, তা না, মহারাণী কাজে যাবে না। আমি বিছানায় পড়ে আছি, আর তুই সেই সুযোগ নিচ্ছিস?’ দোলন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিতাই এর দিকে।

পরদিন ভোর বেলায় সূর্য উঠলে, সুরেশ দোলনকে নিয়ে কোলকাতায় রওনা দেয়। যাওয়ার আগে দোলন নিতাইকে খাইয়ে, স্নান করিয়ে দিয়ে যায়। বলে যায়, ‘সাবধানে থেকো গো। কিছু লাগলে , পিসিকে বোলো। আমি চলি, কেমন’।

কলকাতায় দোলনের ভালোই দর উঠেছিল। পণ্য হয়েছিল, পৃথিবীর আদি ব্যাবসায়। নতুন নাম হল তার। নয়ন। ওদিকে, নিতাইও তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। যেদিন দোলন বাড়ি ছেড়ে চলে আসে, সেদিন থেকে পিসিকেও খুঁজে পায়না সে। অক্ষম নিতাই, চিৎকার করে ক্ষমা চাইতে থাকে দোলনের কাছে। ‘বৌ আমায় ক্ষমা করে দে বৌ। আমি তোকে ভুল বুঝেছি। আমি মহা পাপ করেছি। আমায় ক্ষমা করে দে বৌ... ক্ষমা করে দে...’। তারপর হাতের কাছে যে ভাঙ্গা থালাটা ছিল, সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হাতের শিরা কেটে ফেলে। দোলন নিতাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পায় অনেকটা দেরিতে, মাধবের কাছ থেকে। মাধব, যার আরেক নাম সুরেশ।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারতো। আর পাঁচটা, পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের, করুন গল্পের মত। কিন্তু তা হল না। না, তার মানে এই নয় যে, দোলন পতিতা পল্লী থেকে পালিয়ে গেল। তার তো কোথাও যাওয়ার, জায়গাই ছিল না। সে অন্য একটা রাস্তা বেছে নিল। নিজে না পালিয়ে, অন্য মেয়েদের পালাতে সাহায্য করার রাস্তা।

আগের বার পিউ আর তিথিকে, সু-চতুর ভাবে এই এলাকা থেকে, বার করে দিতে পেরেছিল দোলন। ওদের দুজনকেও বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে, কাজ দেওয়ার নাম করে, বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল মাধব। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম দোলনকে, ‘আচ্ছা, কি লাভ এসব করে? একবারও ভেবে দেখেছ, মাধব জানতে পারলে তোমার কি হাল হবে? তোমার ভয় করে না?’ উত্তরে সে একটু মুচকি হেসে ছিল। তারপর বলেছিল, ‘মরা মানুষের আবার ভয়। জানো

তো মানুষের পেটে যদি খিদে না থাকত, তাহলে কোনো বাবা মা বা স্বামী তাদের বাড়ির মেয়েকে বেঁচে দিত না। মাধবরাও তাদের ভুল বোঝাতে পারত না'।

কিন্তু এবার শেফালিকে বাঁচাতে পারল না দোলন। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে শেফালি। মাধব শেফালিকে শাস্তি দিচ্ছে, তার পায়ের পাতায় গজাল দিয়ে ফুঁটো করে। যাতে সে আর, কোনদিনও পালাতে না পারে। এতে কিন্তু মাধবের ব্যবসার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ তার এই ব্যবসায়, মেয়েদের পায়ের পাতার কোনো দরকার হয়না। সে রাতে আমিও দোলনের ঘরে বসে শুনেছি, শেফালির প্রান বের হয়ে আসা চিৎকার। নিথর হয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ মাধবের গলা পেয়ে, দোলন আমাকে রীতিমতো জোর করে, ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। তারপর কি হয়েছে আমি জানি না।

আপনারা হয়তো ভাবছেন যে, আমি কে? আমি কি করে জানলাম দোলনের এই সমস্ত কথা। আসলে, আমি তেমন কেউ নই। আমি দোলনের কাছে রোজ আসি। আপনারা ভাববেন, সমাজ ভাববে , আমি দোলনের কাস্টমার। তাতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না, বিশ্বাস করুন। কারণ

আমাদের রাত কাটে শুধুই কথা বলে। আমার কথায়, ওর কথায়, ভোর হয়। আমার গলায় কবিতা শুনতে ভালোবাসে দোলন। আমরা দুজনে অনেক স্বপ্ন দেখি। খেতে পাওয়া মানুষের

স্বপ্ন। না এবারও ভুল ভাবছেন আপনারা। ভালবাসার আখ্যা দিয়ে সম্পর্কটাকে সঙ্কীর্ণ করে দিচ্ছেন। যাই হোক আপনাদের কাছ থেকে এটাই কাম্য।

পরদিন খুব তাড়াতাড়ি দোলনের ঘরে গেলাম। গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার পায়ের তলার মাটি সরে গেল। দোলন ঘরে নেই। তার ঘরে নতুন একজন মেয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ' দোলন মানে নয়ন আছে?' মেয়েটা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আমার কাছে এসে বলল, ' কে নয়ন? এখানে এই নামে তো কেউ থাকে না। কোন দিন ছিলও না। তবে আমি আছি গো বাবু , জুঁই…..'। আমার চোখের সামনে জলের মত সব পরিষ্কার হয়ে গেল। হাজার খুঁজলেও দোলনকে আর আমি পাব না। শুধু জানতে ইচ্ছে করে , ও আদেও বেঁচে আছে তো? নাকি ওর হৃদয়টাও বিক্রি হয়ে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে।

***

বিপদ

কমলকুমার ঘোষ

- ও খোকা, ওঠ, অনেক বেলা হল। 'হ্যাঁ, উঠছি, বলে সৌরভ আবার পাশ ফিরল।

মায়ের কাছে ছেলেরা বোধহয় চিরকাল 'খোকা' -ই থেকে যায়।

-ওঠ, তোর আপিসের দেরি হয়ে যাবে।

আমাকে মুখ, হাত ধুইয়ে দিবি না?

চোখ বন্ধ করেই সৌরভ বলল,

-হ্যাঁ দেব, কটা বাজে ?

- সাতটা বেজে গেছে। 'এ্যা' ! বলেই সৌরভ তড়াক করে উঠে বসল। দুটো চোখ হাত দিয়ে কচলে নিয়ে একটু আড়মোড়া ভাঙল। তারপর উঠে পড়ল। বালিস বিছানা ঠিক করে গুছিয়ে রেখে, তোয়ালেটা নিয়ে ঢুকে গেল বাথরুমে।

প্রাতঃক্রিয়া সেরে, দাঁত মেজে বেরিয়ে এসে প্রথমে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। তারপর, নিজের বাবা, মা তারা, লোকনাথ বাবা ও সাঁইবাবার ছবিতে। এটা সৌরভের নিত্য অভ্যাস।

সৌরভদের বাড়ি বেহালায়। বিদ্যাসাগর

হাসপাতালের কাছে। ইউনিক পার্কে। ফ্ল্যাট নয়। দু' কামরার একটা ছিমছাম বাড়ি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িটা বানিয়েছিলেন সৌরভের বাবা শৈলেশ মুখার্জি। যদিও আজ আর তিনি নেই। বছর পাঁচেক আগে প্রস্টেট ক্যান্সারে গত হয়েছেন। ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে টানা দু' বছর চিকিৎসা চলেছে। প্রখ্যাত অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ রাকেশ রায় আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বয়স তখন কতইবা ! মাত্র ৫৯। তার বছর তিনেক আগে তিনি অবশ্য সৌরভের দিদি সৌমিতার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। জামাই রক্তিম ব্যানার্জি মুম্বাই প্রবাসী। নামী আর্কিটেক্ট। নিজস্ব ফার্ম আছে। সৌরভ তখন বেহালা হাইস্কুল পেরিয়ে আশুতোষ কলেজে। সায়েন্স নিয়ে থার্ড ইয়ার।

শৈলেশবাবু সরকারি চাকরি করতেন। এলআইসি-র বড়বাবু। শ্রাদ্ধের দিন অফিসের বন্ধুরা, তাঁদের মধ্যে ইউনিয়নের নেতারাও ছিলেন, সৌরভের মা স্নেহলতা দেবীকে অভয় দিয়ে গেলেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না বৌদি। শৈলেশদা আমাদের দাদার মত। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আমরা

দেখব যাতে আপনি পেনশনটা তাড়াতাড়ি পান। '

চিন্তা অবশ্য করতেই হয়েছিল। প্রায় বছর দেড়েক। বাবার অফিসে তদবির করতে করতে সৌরভের দু' তিন জোড়া জুতোর সুকতলা ছিঁড়ে গিয়েছিল। স্নেহলতা দেবীকেও সেখানে বারচারেক হাজিরা দিতে হয়।

শৈলেশ মুখার্জি মারা যাওয়ার পর থেকে স্নেহলতা ক্রমশ অসুস্থ হতে শুরু করেন। প্রথমদিকে মাঝে মধ্যে একটু বুকের বাঁদিকে ব্যাথা। তারপর রক্তচাপ ওঠানামা করা এবং শেষে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া। আসলে, টানা ত্রিশ বছরের ঝগড়া-ভালোবাসায় জড়ানো বন্ধুটির এই হঠাৎ চলে যাওয়াটা তিনি মন থেকে ঠিক মেনে নিতে পারেননি। বারবার ছেলেমেয়েদের বলতেন, 'তোদের বাবা এমন স্বার্থপরের মত আমাকে একা রেখে চলে গেল কেন, বলতে পারিস?' কথাটা বলেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠতেন।

সৌরভ, সৌমিতা বলত, 'কেন ? আমরাতো আছি। '

পিজি-তে দীর্ঘদিন চিকিৎসা হল। বাইপাস সার্জারিও বাদ গেল না। কিন্তু, তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত স্নেহলতা কারো সাহায্য ছাড়া

বিছানা থেকে উঠতে-নামতে পারেন না। আসলে, শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়াটা এর মূল কারণ। সৌরভ অবশ্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বারো ঘন্টার এক আয়া রেখেছে। তাঁর নাম সরমা। বয়স বছর চল্লিশ। অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি অবশ্য রান্নাটাও করে দেন। কারণ, রান্নার দিদি লক্ষী অন্তঃসত্তা। তাই, মাস দুয়েকের ছুটি নিয়েছে। সরমার পুরো খরচটা পাঠায় সৌমিতা।

ইতিমধ্যে দু' বছর আগে সৌরভ একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। এ জি ফার্মা' নামে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতো শ্যামবাজারের কাছে। তারা কয়েকটা বিশেষ ওষুধ ছাড়াও, অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম, আফটার শেভ লোশন, মাথা ঠান্ডা রাখার তেল ইত্যাদি তৈরি করে। সৌরভ সেখানে কসমেটিক বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার। বেতন মোটামুটি ভালোই। তবে সংসার খরচ, মায়ের চিকিৎসা এবং নিজের হাতখরচের পরে এখনও গাড়ি কেনার কথা ভাবতে

পারেনি। প্রতিদিন হাতে একটু সময় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়। যাতে ২২২ বাসটা ধরে শ্যামবাজার পৌঁছতে পারে বেলা দশটার মধ্যে। ওটাই সরাসরি

যায়। সকাল থেকে বাড়িতে অবশ্য তার প্রচুর কাজ থাকে। ঘুম থেকে উঠেই স্নেহলতা দেবীকে বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে নামিয়ে, কমোড চেয়ারে বসিয়ে পটি করানো, দাঁত মাজানো, মুখ-হাত পরিষ্কার করে দেওয়া, আবার তাকে বিছানায় তুলে বসানো। এসবে অনেক সময় লাগে। এছাড়াও, মাকে চা-বিস্কুট খাইয়ে, সকালের ওষুধগুলো দিতে হয়। এর বাইরে নিজের ব্রেকফাস্ট, চা রেডি করা তো আছেই। লাঞ্চটা সৌরভ অফিস ক্যান্টিনেই সারে। সরমা আসেন আটটায়। সৌরভ তখন বেরিয়ে বাস ধরতে ছোটে। কোনওদিন দেরি হয়ে গেলে, রাসবিহারী বা হাজরা পর্যন্ত অটোয় গিয়ে মেট্রো ধরে। খুব বিপাকে না পড়লে 'ক্যাব' নেয় না। সেই খরচটা বাঁচায়। সরমা যেহেতু ট্রেইনড আয়া, তাই প্রথমদিকে তিনি বাড়ির শাড়িটা ছেড়ে একটা হাল্কা নীল রঙের অ্যাপ্রণ পরতেন। কিন্তু, স্নেহলতার সেটা ভাল লাগত না। তিনি বলতেন, 'তুমি ওটা পোরোনা তো বাপু। কেমন যেন হাঁসপাতালের নার্সের মত লাগে। তুমি শাড়িই পর। তাহলে অন্তত বাড়ির মেয়ে মনে হবে। '

তারপর থেকে সরমা প্রতিদিন এসে বাড়ির শাড়িটা পাল্টে অন্য একটা শাড়ি পরেন। এ' বাড়িতে পা দিয়েই তিনি স্নেহলতাকে কোনও ওষুধ দেওয়ার থাকলে, সেটা খাইয়ে রান্না চাপিয়ে দেন। তারই মধ্যে মাসিমা-র সঙ্গে গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা চলতে থাকে। রান্না আবার দু'রকমের। সৌরভেরটা স্বাভাবিক। মানে, পরিমাণমত তেল, ঝাল, মশলা থাকে। কিন্তু, তার মায়ের তো সেসব চলবে না।

দুপুরে মাসিমা-কে খাট থেকে কোলে করে নামিয়ে ঘরের মধ্যেই স্নান করান সরমা। চুল আঁচড়ে দেন। এরপর তাঁকে খাটে উঠিয়ে নিজে যান স্নানে। কারণ, তা নাহলে স্নেহলতা তার হাতে ভাত খাবেন না। খানিকটা ব্রাহ্মণ্যবোধ। আর, খানিকটা বাতিক। পুরনো মানুষদের যা হয়। তারপর তাঁকে খাইয়ে, ওষুধপত্র দিয়ে নিজে খেয়ে নেন সরমা। ডাইনিং থেকে ফিরে এসে এই ঘরের মেঝেতেই একটু গড়িয়ে নেন। কারণ, পেশেন্ট-কে একা রাখা ঠিক নয়। ঠিক একই কারণে, রাতে সৌরভ নিজের ঘরে না ঘুমিয়ে, মায়ের ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়। সরমা মাঝেমাঝেই বলেন,

-মাসিমা, এবার বাড়িতে একজন বৌমা নিয়ে আসুন।

স্নেহলতার মুখটা কেমন বিষন্ন হয়ে ওঠে। জোর করে ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা টেনে তিনি বলে ওঠেন,

- খোকাকে বহুবার বলেছি মা। ও তো সে কথা নানাভাবে এড়িয়ে যায় কেন, কে জানে?

দিন পনেরো পরের কথা। বেলা তখন প্রায় দু’ টো। নিজের টেবিলেই আটকে আছে সৌরভ। একটা প্রোজেক্ট-এর কাগজপত্র রেডি করছে। চারটের সময় প্রেজেন্টেশন। তাইতো লাঞ্চ করতেও যেতে পারেনি।

আসলে, তার কোম্পানি ‘এ জি ফার্মা’ পুরুষদের একটা হেয়ার ক্রিম বাজারে আনতে চাইছে। যা বেশি তৈলাক্ত হবে না, আবার ধোঁয়া, ধূলো থেকেও বাঁচাবে। খুবই জটিল ফর্মূলা। কসমেটিক বিভাগের চিফ ম্যানেজার সন্দীপন চক্রবর্তী এবার দায়িত্বটা সৌরভের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাই, সৌরভের চিন্তা একটু বেশি।

ঠিক সেইসময়েই মোবাইলটা বেজে উঠল। সৌরভ স্ক্রিনে দেখল, শ্রীপর্ণা। কাজের সময় অকাজের

কেউ ফোন করলে, সৌরভ খুব বিরক্ত হয়। শ্রীপর্ণা সেটা জানে। তাই অফিস টাইমে সচরাচর ফোন করে না। সৌরভ একটু আশ্চর্য হল। ফোনটা তুলে বলল,

- হ্যাঁ, বলছি।

- তুমি কি খুব ব্যস্ত?

- সাঙঘাতিক। কেন? কি হয়েছে?

- এই দেখনা, সকাল থেকে বুবুনের খুব জ্বর। এখন ১০২। জলপট্টি দিয়েও কমছে না। কি যে করি!

- ডাক্তার বক্সিকে ফোন করেছিলে?

- হ্যাঁ। উনি ক্রোসিন লিকুইড দিতে বললেন। একটু আগে তাও খাওয়ালাম।

-তাহলে দেখ, নিশ্চয়ই কমে যাবে। আমি তো সন্ধের আগে অফিস থেকে নড়তে পারব না। যে নতুন প্রোজেক্টের কথা বলেছিলাম, তার প্রেজেন্টেশন আজ।

- ঠিক আছে। সেসব শেষ হলে সোজা আমার বাড়ি চলে এস। খুব ভয় করছে।

- আচ্ছা। অকারণে দুশ্চিন্তা করো না।

ফোনটা ছেড়েই সৌরভ আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

শ্রীপর্ণার বাড়ি সিঁথিতে। বাড়ি মানে ফ্ল্যাট। ‘গীতাঞ্জলি’ অ্যাপার্টমেন্টে। শ্রীপর্ণার স্বামী সন্দীপ সেন ছিল প্রোমোটার। এই ‘গীতাঞ্জলি’ -ও তারই তৈরি। বছরদুয়েক আগে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় সন্দীপ মারা যায়। সঙ্গে আরও তিনজন। পুলিসের বক্তব্য, মত্ত অবস্থায় সন্দীপ নিজেই স্করপিওটা চালাচ্ছিল।

এই ঘটনার পরে সন্দীপ যেন শ্রীপর্ণাকে ধূ ধূ মরুভূমির মধ্যে একা দাঁড় করিয়ে দিল। কারণ, তার সামনে-পেছনে দাঁরানোর মত কেউ নেই। পিছুটান না থাকলে হয়ত সে সুইসাইড করে বসত। পারল না শুধু কোলের ছেলে বুবুনের জন্য। তখন সে মাত্র দু’ বছরের।

শ্রীপর্ণার বাপের বাড়ি ব্যারাকপুরে। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। অত্যন্ত মধ্যবিত্ত পরিবার। বাবা ভবেশ গুপ্ত ছিলেন রাইটার্সে। অর্থ দপ্তরের কেরানি। মা মণীষা দেবী গ্যাস্ট্রিকের রোগী। চিররুগ্ন। বাড়ির সব কাজ তাই শ্রীপর্ণাকেই করতে হত। সেসব সেরে ছুটত শ্যামবাজারের মনীন্দ্র কলেজে। সেখান থেকেই শ্রীপর্ণা বি এ পাশ করে। এর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন মনীষা দেবী ‘নেই হয়ে যান। শ্রীপর্ণার বিয়ের পরে বাবাও।

মা-বাবার চলে যাওয়াটা শ্রীপর্ণাকে যথেষ্ট মানসিক কষ্ট দিলেও, সন্দীপের সঙ্গে তখন তার সুখের সংসার। তাই, সেই সুখ ও ঐশ্বর্য্যের প্রলেপে শোক খানিকটা প্রশমিত হয়।

কিন্তু সন্দীপের আকস্মিক দুর্ঘটনা তাকে আক্ষরিক অর্থে দিশেহারা করে তোলে। দিনরাত সে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে। আর্থিক নয়, মানসিক। কারণ, সন্দীপের টাকা ছিল অঢেল। কিন্তু, এত বড় শহরে একা শ্রীপর্ণা অতটুকু ছেলেকে নিয়ে কী করবে, কীভাবে জীবনে এগোবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। ‘গীতাঞ্জলী-র অন্যান্য আবাসিকরা অবশ্য আগাগোড়া শ্রীপর্ণার পাশেই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উদ্যোগী ‘বিশ্বাস কাকিমা'। সুনেত্রা বিশ্বাস। একটা এনজিও চালান। পথশিশুদের নিয়ে কাজ। নাম ‘পথের দাবী’। শ্রীপর্ণার একাকীত্ব ও বিষন্নতা কাটাতে সেখানেই তাকে নিয়ে নেন সুনেত্রা। কয়েকদিন সেই সংস্থায় যাতায়াত করার

পরে, কাজটা বেশ ভালো লাগে শ্রীপর্ণার। সে খুশি হয়। আবার, পথশিশুদের করুণ অবস্থার কথা জেনে কষ্টও পায়।

সৌরভের সঙ্গে শ্রীপর্ণার আলাপ হয়েছিল পথেই। বছরখানেক আগে। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। সেদিন বিকেলে ওখানেই ‘পথের দাবী’-র অর্থ সংগ্রহ অভিযান চলছিল- এক্সকিউজ মি। সৌরভের উদ্দ্যেশ্যে কথাটা বলে শ্রীপর্ণা।

সৌরভের দৃষ্টি তখন ফিরতি বাসের গতিপথে। ২২২ আসছে কি না, সেদিকেই তার নজর। মনে মনে একটু উদ্বিগ্নও বটে। সকালে দেখে এসেছে মায়ের শরীরটা খারাপ।

- এই যে শুনছেন?

এবার সৌরভের সম্বিত ফেরে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে সামনে এক সুন্দরী মহিলা।

- আমাকে বলছেন?

- হ্যাঁ, আপনাকেই।

- দেখুন আমরা পথশিশুদের নিয়ে কাজ করি। শিশুশ্রম আটকানোরও চেষ্টা করি। আমাদের সংগঠনের নাম ‘পথের দাবী। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত। আজ রাস্তায় নেমেছি একটা ‘ফান্ড

রেইজিং ক্যাম্পেন’ করতে। ঐ দেখুন আমার সঙ্গে অন্যান্য মহিলারাও আছেন। সৌরভ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, ঠিকই। আরও কয়েকজন ভদ্রমহিলা বাস স্টপেজে নানা মানুষের কাছে সাহায্য চাইছেন। তাঁদের মধ্যে বয়স্করাও রয়েছেন। কিন্তু সৌরভ অত সহজে পকেট থেকে টাকা বের করার পাত্র নয়। তাকে অনেক হিসেব করে চলতে হয়। তাই, শ্রীপর্ণার দিকে ঘুরে বলল,

- তার মানে এনজিও? আপনারা তো বিদেশ থেকে প্রচুর টাকা অনুদান পান। তাহলে, এভাবে রাস্তায় নেমেছেন কেন ?

হেসে ফেলল শ্রীপর্ণা।

- না স্যার। এখনও আমাদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। তাছাড়া, ওসব পেতে গেলে প্রচুর ধরা-করার লোক চাই। মানে, ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। আমাদের আশেপাশে তেমন কেউ নেই। যতটুকু করতে পারছি, নিজেদের চেষ্টায়। তাই বলছিলাম, আপনি যদি কিছু সাহায্য করেন।

সৌরভ বুঝতে পারল, নিস্তার নেই। ভদ্রতার খাতিরে কিছু খসাতেই হবে। ব্যাক পকেট থেকে পার্স বের করে সে দেখল টাকা কমই আছে।

সেখান থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিল। বিল বই, পেন শ্রীপর্ণার হাতেই ছিল।

জিজ্ঞেস করল,

- কি নাম লিখব?

- সৌরভ মুখার্জি। ইতিমধ্যে সে দু' তিনবার বাসের গতিপথে নজর দিয়েছে। বেহালাগামী একটা বাসেরও নম্বর দেখতে পায়নি। হঠাৎ সৌরভ খেয়াল করল, পাইকপাড়ার দিক থেকে একটা 'থ্রি ডি' বাস এসে, চলতি অবস্থাতেই দু' চারজন যাত্রী তুলে হুস করে বেরিয়ে গেল। সৌরভের মুখে শোনা গেল এক হতাশ উক্তি,

- যাঃ।

বিল বই থেকে চোখটা একটু ত্যারচা করে তুলে শ্রীপর্ণা জিজ্ঞেস করল,

- কি হল? সৌরভ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, - না, তেমন কিছু নয়। ঐ একটা বাস নাকের ডগা দিয়ে চলে গেল। আবার কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে, কে জানে!

শ্রীপর্ণা যেন একটু লজ্জিত হল ! রসিদটা কেটে এগিয়ে দিয়ে বলল,

- সরি। আমার জন্যে আপনার ক্ষতি হয়ে গেল।

- না না। ঠিক আছে। পেয়ে যাব।

- কোথায় থাকেন আপনি?

- বেহালা।

- উরে বাবা, সে তো অনেক দূর।

- কি আর করা যাবে ? চাকরি করতে হলে তো দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসতেই হবে।

শ্রীপর্ণা হেসে বলল,

- ওকে, থ্যাঙ্কস।

সৌরভ দেখল, হাসলে শর্মিলা ঠাকুরের মত মহিলার গালে টোল পড়ে। সে একটু মুগ্ধ হল।

মাসখনেক পর আবার দেখা। সেই বিকেলে। সৌরভের বাড়ি ফেরার সময়। পাঁচমাথা মোড়েই। হঠাৎ সৌরভ দেখল, একটা বাচ্চা ছেলের হাত ধরে, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফড়িয়াপুকুরের দিকে হেঁটে চলেছেন সেই 'টোল পড়া গাল'। সৌরভ একটু চেঁচিয়ে বলল,

- কোথায় চললেন? আজও কি 'ক্যাম্পেন' নাকি?

শ্রীপর্ণা ঠিক চিনতে পারল না। পারার কথাও নয়। কত মানুষকেই তো প্রতিদিন দেখছে। তবে, ‘ক্যাম্পেন’ শব্দটা শুনে বুঝতে পারল, ইনি নিশ্চয় কোনওদিন ‘পথের দাবী’ -কে অর্থ সাহায্য করেছেন। দু’পা এগিয়ে এসে বলল,

- ঠিক চিনলাম না।

এবার সৌরভ পড়ল মহা ফ্যাসাদে। ভদ্রমহিলা যদি তাকে হ্যাংলা ভাবেন! তাড়াতাড়ি সেটা ম্যানেজ করার জন্য একটু আমতা আমতা করে বলে উঠল,

- না, মানে, আপনি সেই এনজিও তো? পথশিশুদের নিয়ে কাজ করেন !

শ্রীপর্ণা উত্তর দিল,

- হ্যাঁ।

সৌরভ খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। এরপর কী বলবে, ঠিক বুঝতে না পেরে ফস্ করে বলে ফেলল,

- আমি বেহালায় থাকি।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে শ্রীপর্ণা বলল,

-ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। আপনি আমাদের ডোনেট করেছিলেন।

সৌরভ এবার নিশ্চিন্ত হল। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করল,

-তা, আপনি এদিকে যাচ্ছেন কোথায়?

- এই সামনে ব্লাউজের দোকানে।

- সঙ্গে এটি কে ?

- আমার ছেলে। সৌরভ একটু আশ্চর্য হল। ভদ্রমহিলার সিঁথিতে তো সিঁদুর নেই। তারপর ভাবল, আজকাল অবশ্য অনেকেই সিঁদুর-টিদুর

পরে না। তাছাড়া, এখন তো আবার সিঙ্গল মাদারের যুগ। তারপর একগাল হেসে বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করল,

- তোমার নাম কি ?

ছেলেটি ঘাড় তুলে মায়ের দিকে তাকাল। শ্রীপর্ণা বলল,

- আঙ্কলকে তোমার নাম বল।

- বুবুন।

- ভালো নাম ?

- ঋত্বিক সেন।

- বাঃ খুব সুন্দর নাম।

শ্রীপর্ণার দিকে তাকিয়ে সৌরভ বলল,

- আপনার যথেষ্ট তাড়া না থাকলে, চলুন না কোথাও বসে একটু চা খাই।

হঠাৎ কোনও পুরুষের এই ধরনের অফারে শ্রীপর্ণা কখনই সায় দেয় না। কিন্তু সৌরভের মার্জিত ব্যবহার প্রথমদিন থেকেই তার ভালো লেগেছে। তাই আজ আর আপত্তি করতে পারল না। সৌরভ দেখল, সামনেই কলকাতার অতি প্রাচীন 'ন্যাশনাল ইকনমিক রেস্টুরেন্ট' । নামের মধ্যেই একটা দামের আভাস পাওয়া যায়। নাহলে, উল্টোদিকে 'গোলবাড়ি' -তে ঢুকলে অনেক খসবে। রেস্টুরেন্টে

বসে চা, টোস্ট, ওমলেট আর বুবুনের জন্য পোচ অর্ডার দিয়ে সৌরভ বলল,

- আপনার টেলিফোন নম্বরটা পেতে পারি মিসেস সেন ?

সৌরভের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে শ্রীপর্ণা একটু গম্ভীর হয়ে বলে উঠল,

-সরি। আমি মিসেস সেন নই। শ্রীপর্ণা গুপ্ত। সারাজীবন বাবার পদবীটাই ব্যবহার করি। সৌরভ এবার সত্যিই হকচকিয়ে গেল। আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারল না। আবার, জিজ্ঞেস করার সাহসও হল না।

এরপর দিনদিন ঘন হতে থাকে শ্রীপর্ণা ও সৌরভের মেলামেশা। দু'জনের কাছেই ক্রমশ উন্মোচিত হয় পরস্পরের জীবনকাহিনী। ভালো লাগা ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ে ভালবাসার দিকে। সৌরভ কিন্তু শ্রীপর্ণাকে নিয়ে দক্ষিণে যায় না। অত দূর গেলে দেরি হয়ে যাবে। আসলে, তার ভয়, পাছে পরিচিত কেউ দেখে ফেলে ! তাই সিনেমা, নাটক বা অন্য কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সবই উত্তরে সীমাবদ্ধ রাখে। শুধু একবার দুর্গাপুজোর পরে 'বিসর্জন কার্নিভাল' দেখতে শ্রীপর্ণা আর বুবুনকে নিয়ে রেড রোডে গিয়েছিল। সৌরভ যখন

শ্রীপর্ণার ফ্ল্যাটে যাতায়াত শুরু করে, তখন 'গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট' -এর লোকজন একটু কপাল কুঁচকেছিল। পরে, 'আহারে মেয়েটা বড্ড একা' এই আন্তরিক অনুভূতিতে সবাই মেনে নিয়েছে। আর, এখন তো দুর্গাপুজোতেও সৌরভ বড় ভূমিকা নেয়। বিজ্ঞাপনও তুলে দেয়।

বই কুটির কলকাতা
শারদ সংখ্যা ১৪২৮

সারাদিন ‘প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন’ ও অফিসের অন্যান্য কাজের চাপে বুবুনের জ্বরের কথাটা সৌরভ ভুলে গিয়েছিল। শ্রীপর্ণাও আর ফোন করেনি। হঠাৎ সন্ধেবেলায় মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি কাঁধের স্লিং ব্যাগটা নিয়ে রওনা দিল। ‘গীতাঞ্জলি’ -তে পৌঁছে দেখল, বুবুন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। জ্বরটাও কমেছে। কিন্তু ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকার। সিঁথির মোড় থেকে ডানদিকে ঢুকলেই দুটো বাড়ির পরে ‘গীতাঞ্জলি'। আর, বি টি রোড টপকালেই ওপারের রাস্তায় ডাঃ সুমিতাভ বক্সির চেম্বার। শ্রীপর্ণা ফোন করতেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে গেল। বহুদিনের চেনা। এই আবাসনের প্রায় সবাই তাঁকে দেখায়। সৌরভ বলল,

- গাড়ি বের করার দরকার নেই। চল, হেঁটে চলে যাই। বুবুনকে আমি কোলে নিচ্ছি।

শ্রীপর্ণা সায় দিল।

মোড়ের ট্রাফিক সিগন্যালটা আজ খারাপ। বিটি রোডের যানজট সামলাতে নগররক্ষীদের নাজেহাল অবস্থা। বুবুন সৌরভের কোলেই ছিল। রাস্তা পার হওয়ার জন্য পুলিস হাত দেখাতেই, সৌরভ শ্রীপর্ণার বাঁ হাতটা ধরে নিল। যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। রাস্তাঘাটে সৌরভ এভাবে হাত ধরলে খারাপ লাগে না শ্রীপর্ণার। বরং ভরসার পারদটা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে।

বুবুনকে পরীক্ষা করে ডাঃ বক্সি একটা প্রসক্রিপশন লিখে দিয়ে বললেন,

- তেমন কিছু হয়নি। সিজন চেঞ্জের জন্য অনেক বাচ্চাই ভুগছে সর্দি, কাশি, জ্বরে। এই ওষুধগুলো খাক। ঠিক হয়ে যাবে।

বুবুন আর শ্রীপর্ণাকে ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে সৌরভ যখন বেরলো, ঘড়িতে তখন রাত আটটা।

বাড়ি ফিরতে আজ যে বেশ দেরি হবে, বুঝতেই পারল। মনে মনে ভাবল, সরমাদি আজ যদি একটু বেশিক্ষণ থাকে, ভালো হয়। নাহলে মা-কে একা থাকতে হবে। সরমাকে ফোন করবে বলে

মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতেই তার মাথায় যেন বাজ পড়ল। বিন্দুমাত্র চার্জ নেই। ব্যস্ততার মধ্যে খেয়াল করেনি। আর একটা কথা মনে পড়ল, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে চার্জারটাও অফিসের ড্রয়ারে ফেলে এসেছে। অগত্যা বাসের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল। কোথায় ২২২? সৌরভ এবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না, এই ভেবে শ্যামবাজারগামী একটা অটোতে উঠে পড়ল। সেখান থেকে যদি ‘থ্রি ডি পাওয়া যায়।

কিন্তু না। শ্যামবাজার মোড়ে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও দেখল, বেহালাগামী কোনও বাস নেই। স্টপেজে দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করল। সবাই বললেন, ‘বহুক্ষণ দেখিনি’ । এদিকে ঘড়ির কাঁটা ততক্ষণে ন’টার ঘরে। সৌরভ এবার একটু বিরক্ত হল। বুঝতে পারল ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই। কিন্তু একি! প্রত্যেকটা ট্যাক্সিই তো ‘রিফিউজ’ করছে। এমনকি, অ্যাপ ক্যাব-ও। কেউ বেহালার দিকে যাবে না। একস্ট্রা’ দিলেও নয়। শেষে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার জানাল, মোমিনপুরের কাছে একটা নার্সিংহোমে রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধেছে। রোগীর বাড়ির লোকজন ভাঙচুর চালিয়েছে। ডাক্তারদের ধরে মেরেছে। তারপর, পুলিস এসে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতেই পথ অবরোধ শুরু হয়েছে। একেবারে খিদিরপুর পর্যন্ত। এখনও চলছে। সৌরভ পড়ল মহাবিপদে। এবার কি হবে! এতক্ষণ তো নিশ্চয় এ’ খবর টিভিতে সবাই দেখে ফেলেছে। এমনকি তার মা স্নেহলতাও। টেনশনে তার হার্ট অ্যাটাক না হয়! সে তখন মনে মনে মা তারা, লোকনাথ বাবা থেকে শুরু করে, সকালে ঘুম থেকে উঠে যেসবস দেবদেবীকে প্রণাম করে, তাদের সবাইকে ডাকতে শুরু করল। তার তখন কেঁদে ফেলার অবস্থা। শেষমেষ একটা হলুদ ট্যাক্সি রাজি হল। যাবে। কিন্তু অনেক ঘুরে যেতে হবে। পাঁচশ টাকা লাগবে। সৌরভ দেখল, আজ আর কিপ্টমি করে কোনও লাভ নেই। সে রাজি হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা যখন দাঁড়াল, তখন অনেক রাত। সৌরভ হাতঘড়িতে দেখল, প্রায় সাড়ে এগারোটা। সেখানে তখন অনেক লোক। তাদের মধ্যে মহিলাও আছে। পাড়ার জনাদুয়েক খুচরো রাজনৈতিক নেতাও। আর, একটু দূরে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সরমা। এইবার সৌরভের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ‘সরমাদি এখনও বাড়ি যায়নি! তাহলে কি মায়ের কোনও বিপদ হল!’ একটা কান্নার ঢেউ যেন তার বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দমকা বাতাসের মত তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,

- কি হয়েছে ?

সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। ধেয়ে এল প্রশ্নের বাণ।

- কি হয়েছে ? ন্যাকা।

- অসুস্থ মাকে বাড়িতে রেখে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাক?

- একটা মিনিমাম সেন্স নেই?

- তোমার জন্য ঐ ভদ্রমহিলাও বাড়ি যেতে পারেননি।

- দেখ্, বোধহয় প্রেম-টেম করছে।

এবার একজন খুচরো নেতা এগিয়ে এসে সৌরভকে বাঁচাল।

- ওকে এবার ছেড়ে দিন। বাড়ির ভেতরে যাক। মোমিনপুরের ঝামেলার জন্য বোধহয় ওর দেরি হয়েছে। সৌরভ আমতা আমতা করে বলল,

-হ্যাঁ। ঠিক তাই।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে কান্নার ঢেউটা আর সামলাতে পারল না সৌরভ। দেওয়ালে মাথা রেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

- মায়ের কি হয়েছে সরমাদি? আমার মা কি আর নেই? মা, ওমা, মাগো।

সরমা এবার একটু হাল্কা ধমকের সুরে বলে উঠল,

- আঃ। আস্তে মাসিমা জেগে যাবেন।

সৌরভ এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

- ওঃ মায়ের তাহলে কিছু হয়নি?

বলেই ছুটে চলে গেল মায়ের ঘরের দিকে। পেছনে সরমাও।

- ডাকবেন না। মাসিমা ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার বোস এসে ওষুধ দিয়ে গেছেন। বলেছেন, ডিসটার্ব না করতে।

- মায়ের হয়েছিল কি ?

- বাইরে আসুন, বলছি। চা খাবেন?

- হ্যাঁ। একটু কড়া করে।

সৌরভকে চা-বিস্কুট দিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে সরমা বলল,

- সন্ধেবেলায় মাসিমা আর আমি 'রাণী রাসমণি' দেখছিলাম। তারপর টিভি চলতে থাকে। আমি রান্না করতে চলে যাই। ঠিক তখনই মাসিমার একটা ফোন আসে। কে করেছিল, বলতে পারব

না। ফোনটা ছেড়েই মাসিমা কেমন একটা অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেন। কেবলই ভুল বকতে থাকেন। খালি বলেন, 'খোকা আমায় সত্যি কথাটা বলতে পারল না? আমার কপালে এই ছিল? ছোট থেকে যাকে আঁচলের তলায় রেখে মানুষ করলুম, সে আমাকে এতবড় আঘাত দিল? দিতে পারল? হে ভগবান, আমাকে এবার তুলে নাও। এই যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে মাসিমা?' কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন, 'ও তুমি বুঝবে না মা। খোকা আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে। ' সৌরভ খুব আশ্চর্য্য হল। চোখ-কপাল কুঁচকে স্বগতোক্তি করল,

- আমি মায়ের সঙ্গে বেইমানি করেছি? সত্যি কথা বলিনি? কোন কথা? কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না।

সরমা বলল,

- আমিও বুঝতে পারিনি।

তারপর দেখি, মাসিমার গা পুড়ে যাচ্ছে, থার্মোমিটার দিলাম। ১০৩ ডিগ্রি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেবপ্রিয় বসুকে কল করলাম। উনি এলেন। ওনাকে সব বললাম। দেখে-টেখে উনি জানালেন, গুরুতর কিছু মনে হচ্ছে না। বোধহয়,

কোনও কারণে মেন্টাল শক পেয়েছেন। তারপর, ওষুধ লিখে দিলেন। আপনাকে বহুবার ফোন করে পেলাম না। তখন, পাশের বাড়ির উকিলবাবু মানে গাঙ্গুলিবাবুকে ডেকে নিয়ে এলাম। উনিই পাড়ার অন্যান্যদের খবর দিলেন। ওষুধপত্র আনারও ব্যবস্থা করলেন। সৌরভ সরমাকে জিজ্ঞেস করল,

- আপনি তো এতরাতে আর ফিরতে পারবেন না।

- না বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছি।

- তাহলে আপনি আজ আমার ঘরে ঘুমান। আমি মায়ের কাছেই থাকব। রাতে কোনওমতে খাওয়া-দাওয়া চুকল। সৌরভ ভালো করে খেতেই পারল না। দুশ্চিন্তা তখন তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সারারাত সে দু' চোখের পাতা এক করতে পারল না। বারবার শুধু বাইরে গিয়ে একের পর এক সিগারেট খেয়ে গেল। আর ভাবতে লাগল, সে মায়ের কাছে এমন কী গর্হিত অপরাধ করেছে!

ভোরের দিকে সৌরভের চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল। চেয়ারে বসেই ঢুলছিল। ঠিক সেই সময়ে ঘুম ভাঙল স্নেহলতার। চোখের সামনে ছেলেকে দেখে তার চোখে জল এল। তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করলেন না। কান্নামিশ্রিত অভিমানী কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন,

- এটা তুই কি করলি খোকা? আমাকে জানালে আমি কি আপত্তি করতুম?

সৌরভের চোখ দুটোও তখন ভিজে উঠেছে।

- কি করেছি মা ? তোমাকে না জানিয়ে আমি কি করেছি ?

- তুই বিয়ে করেছিস। তোর একটা বাচ্চা আছে। বলিসনি তো আমায়!

- কি সব আজগুবি কথা বলছ মা?

- ঠিকই বলছি। কাল তোর ছোট মামা বনহুগলি যাচ্ছিল। নিজে চোখে দেখেছে।

- ছোটমামা কাকে দেখতে কাকে দেখেছে ! আর তুমি সেই কথাটা বিশ্বাস করে এত কষ্ট পেলে ?

- তোর ছোটমামার চোখে ন্যাবা হয়নি। ঠিক দেখেছে। তোর কোলে একটা বাচ্চা। আর তুই বৌ-এর হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছিস। মায়ের মুখে একথা শুনে সৌরভ কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, 'যাচ্চলে, এ কি বিপদে পড়লাম! এতদিন যে কারণে শ্রীপর্ণা, বুবুনকে দক্ষিণে আনিনি, সেই বজ্রআঁটুনি শেষে ছোটমামা উত্তরে গিয়ে ফস্কা গেরো করে দিল!'

***

প্রসন্নতা

সুনীতি মণ্ডল

" মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।"

১৪১৯ সালের ৬ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার মহানবমীর দিনটা

আমার জীবনের পরমানন্দের দিন। জীবনে প্রথমবার বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ছিলাম। গৌর মোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলাম তখন.এর আগে যদিও মায়ের সঙ্গে সুন্দরবন সংলগ্ন কৈখালি তে এক আত্মীয়ের গৃহে মেলা উপলক্ষে বেড়াতে গিয়ে, সেখানকার আশ্রম দর্শন করতে গিয়ে ছিলাম। কিন্তু তখন শুধুমাত্র মা ছিলেন আমার সঙ্গে, বাবা আত্মীয়ের বাড়িতে যাননি।

যাইহোক এই প্রথম সেই মহানন্দ পাওয়া। শান্তির পরমাশ্রয় স্থলে বেড়াতে গেলাম বাবা- মা, আমি আর ছোড়দা।

যেখানে পবিত্র সুরধ্বনী গঙ্গার প্রবাহ সকল আর্ত, তৃষ্ণার্ত কে শীতল মধুর বাতাস দেয়, মৃদু তরঙ্গে হৃদয়ে লহরী জাগায়। গঙ্গা তীরের শ্যামল পদপরাজির শীতল ছায়া মনে প্রশান্তি আনে।

সংসার সমুদ্রে যখন আমরা তলিয়ে যাই, বিরহানলে ভষ্মীভূত হয় সবুজ মন, সন্তপ্ত দগ্ধ হৃদয় এমতাবস্থায় অন্বেষণ করে এক শান্তির ঠিকানা। নির্জন স্থান, শিরশিরে মৃদু বাতাস, সবুজ বনানী ঘেরা পবিত্র গঙ্গার সমীপে উপবেশন করে মনের আনন্দে দুটো সুখ- দুঃখের গল্প করতে কার না ভালো লাগে? মানসপটে আঁকা চিত্রের ন্যায় অপলক দৃষ্টিতে এমন সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয়। মনে হয় নিষ্পলক ভাবে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে দৃষ্টি স্বার্থক করি।

" পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ।।"

পিতা মাতা আমার জীবনের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গুরুদেব।

পিতা মাতার হাত ধরে এমন মনোমুগ্ধকর স্থানে প্রথম ভ্রমণ করলাম। যেখানে পক্ষিকুল ক্লান্ত দূরাগত পথিকের মনে প্রীত্যোৎপন্ন করার জন্য মধুর সুরে গান গায়। যেখানে নদীর ঢেউ গর্জন ভুলে গিয়ে শ্রুতি মধুর কল্লোলে হৃদয়ের তানপুরা বাজায়। যেখানকার দুর্বাঘাস গুলি এমনই সুকোমল, পেলব, হরিদ্বর্ণ যে তাদেরকে পদদলিত না করে তাদের সান্নিধ্য পেতে ইচ্ছে করে। মনে হয় সদ্য গজিয়ে ওঠা তৃণ গুলিকে আলিঙ্গন করে, তাদের উপর গড়িয়ে গড়িয়ে উপভোগ করি তাদের সিক্ততা, কোমলতা, অঙ্গ ভেজাই শিশিরস্নাত শীতলতায়। আর যখন ওরা আমার অনুভূতির সাথে তাল মেলাতে শিহরণ জাগাবে আমার মনে, আমিও তখন সারল্যপূর্ণ শিশুর ন্যায় খিলখিল করে হেসে উঠবো। যেখানকার মাটিতে পদার্পণ করার পূর্বে শ্রদ্ধা পূর্বক তিলক স্বরূপ ললাটে ধারণ করে পুণ্যভূমির আশীর্বাদ গ্রহণ করতে মন তৎপর হয়। সেখানে গিয়েছিলাম আমরা।

কৌতূহলের তরণী বোধকরি মাঝনদীতে, কিনারা হয়নি বুঝি? আর বিলম্বিত লয়ে গাইবো না। এবার অবসান ঘটবে আগ্রহের। রূপ লাবণ্যপ্রভা তৃপ্তিদায়ক সৌন্দর্যের ডালি সজ্জিত করে অপেক্ষা করছে, আমরা যে রূপের দর্শনাভিলাষী।

" উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যানি মনোরথৈঃ।

ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশ্যন্তি মুখে মৃগাঃ।।"

অনেকদিন থেকেই মনে ভাবনা ছিল যে দক্ষিণেশ্বর, আদ্যাপীঠ এবং বেলুড় মঠে বেড়াতে যাবো। আজ সেই উদ্যোগ সফল হয়েছে।

বহু কষ্টের পর অতিক্রান্ত পথের প্রান্তে মা ভবতারিণীর চরণ সমীপে উপস্থিত হতে পেতে মনে প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হয়েছে।

মাতা গঙ্গার দর্শনার্থে কত আশা নিয়ে ছুটে গেছি তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে । স্বর্গাদাগতা সুরধ্বনি গঙ্গা মাতা আমার মনের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নকালীন আদিত্য যখন বিষ্ণু নামে পূজিত হন, তখন সেই মধ্যাহ্ন গগনের তীব্র জাজ্জ্বল্যমান কিরণে আমাদের কৃষ্ণ বর্ণ নয়নমণি যখন পীতবর্ণ ধারণ করেছে তখনই, ঠিক তখনই মাতা গঙ্গা তাঁর মৃদু শীতল সমীরণে আঁখি জুড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি, দাদা, বাবা- মা গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করে স্নানের ঘাটে একটা একটা ধাপ অতিক্রম করে অবতরণ করতে আরম্ভ করলাম । আমি মায়ের হাত ধরে এক-পা, দু-পা করে অতি সন্তর্পণে কিঞ্চিৎ কম্পনের সহিত নামছিলাম, ঠিক যেমন করে শিশুর প্রথম পদচারণ শুরু হয় মায়ের হাত ধরে।

" ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোऽপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।। "

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক গঙ্গা জল স্পর্শ করে মাথায় ছিটিয়ে দিলাম। মনে হলো বহুদিন পর আপন জনের ছোঁয়া পেলাম। ধীরে ধীরে মায়ের সাথে আবক্ষ জলে নেমে অনুভব করলাম যে হাল্কা স্রোত বইছে। অবগাহন করে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য যখন ডুব দিলাম, তখন মনে হলো স্নেহময়ী গঙ্গা দু বাহু প্রসারিত করে তাঁর মধুর আলিঙ্গন দিলেন।

স্নানান্তে এই মন্ত্রে সূর্য প্রণাম করলাম।

" ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।

ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোऽস্মি দিবাকরম্।। "

এরপর

" সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখ - বিনাশিনী।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাং গতিম্ ।।"

এই মন্ত্রে গঙ্গা প্রণাম করে একরাশ প্রশান্তি নিয়ে উপরে উঠে এলাম। অনেকেই স্নান করছিলেন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে।

স্নানসিক্ত বসন পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে একটি তরুতলে সিক্ত কেশ এলায়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে স্বল্প কেশশৃঙ্গারে শীঘ্রই মা ভবতারিণীর দর্শনের জন্য উপস্থিত হলাম লম্বা

লাইনে। কয়েকজন মাতৃ ভক্ত পথে গালিচা বিছাতে তৎপরত ছিলেন।আমি ভাবলাম এখানেই কি প্রসাদ দেওয়া হবে? এই চড়া রৌদ্রে? দাদাকে জিজ্ঞেস করতেই এ সংশয় দূরীভূত হলো।

আমরা শুধু ভাবি ভক্তরাই শুধু মাকে ভালোবাসে, কিন্তু এক তরফা ভালোবাসা কি পূর্ণতা লাভ করে ? যখন আমরা কোনো ব্যক্তিকে স্মরণ করি, তখন একটা তো কারণ থাকে। অকারণে কোনো বিষয় স্মৃতি পটে স্থানাধিকার করতে পারে না। একটা কারণ অবশ্যই থাকবে। সেরূপ মাকে আমরা শুধু ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, মায়ের স্মরণ করি........ এমনটা কিন্তু নয়,

মা ও আমাদের কথা ভাবেন। আমরা সবাই যে তাঁরই সন্তান! সন্তানের সুখ-দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা সবই মা অনুভব করেন। তাই তো সন্তান ক্লান্ত হলে মা তাকে নিজক্রোড়ে নিয়ে পরম যত্নে মুছিয়ে দেন সমস্ত ক্লেশ। ললাটে স্নেহ চুম্বন দিয়ে, শিরোপরি হস্ত স্থাপন করে আশীর্বাদ দান করেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা সন্তানের পূর্বে মাতৃ হৃদয়ে স্থান পায়। তাই সন্তানের কষ্ট লাঘব করার জন্য কোমল গালিচা বিছাতে সেবায়িত ভক্তদের মনে জাগায় সেবার অনুভূতি। যাতে দূরাগত সন্তানদের কষ্ট না হয়। সন্তানের কিঞ্চিৎ কষ্ট দেখলে মা অধিক কষ্ট পান।

অবশেষে মাতৃদর্শনে সার্থক নয়নে তৃপ্তি জাগরিত হলো। হৃদয়ে জাগরিত হয়েছে ভক্তি, শ্রদ্ধা, মাতৃ প্রেম। চোখে মুখে কোথাও এতটুকু দুঃখের লেশমাত্র নেই। জন্ম থেকে অদ্যাবধি যত দুঃখ রাশি সঞ্চিত হয়ে পর্বত প্রমাণ দুর্গ নির্মাণ করেছে, সেই দুর্গেশনন্দিনী আজ আনন্দঘন মাতৃ প্রেমে বিভোর হয়ে গেছে। গাঁয়ের পুষ্করিণী তে একাকিনী স্নানার্থে কদাচিৎ গমনে দুঃসাহস দেখিয়েছে সে। যদিও আজ মায়ের সঙ্গে স্নান সমাপন হয়েছে তার। তবে আজ কোনো ভয় তাকে গ্রাস করেনি। এক অনির্বচনীয় নৈস্বর্গিক আনন্দ সমস্ত বিভীষিকা র করাল মূর্তি কে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেছে তা অগোচরে রয়ে গেছে আজও।

মাতৃপূজা, মাতৃদর্শন ও প্রণামান্তে সবাই গেলাম দ্বাদশ শিবলিঙ্গ দর্শনে। ছয়টি শিবমন্দির দর্শন করার পর দাদা অন্য মন্দির গুলি আর দেখতে চাইলো না, বললো সবই তো একই। অগত্যা রামকৃষ্ণ দেবের কক্ষে প্রবেশ করলাম। ধ্যানাবিষ্ট বহু মানুষ কে দেখেই আমিও নয়ন মুদিয়া এক নিমেষ উপবেশন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুরুন্মিলন করায় অবগত হলাম যে আমার পিতৃদেব এখনও এ কক্ষে প্রবেশ করেননি। তাঁকে এ স্থান দর্শন করানোর জন্য দ্রুত বাইরে গিয়ে কিঞ্চিদন্বেষণে সন্ধান পেলাম। এই সুযোগে অবশিষ্ট ছয়টি শিব মন্দিরে দ্রুত গিয়ে প্রণাম করে, আমার বাবাকে নিয়ে প্রবেশ করলাম পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কক্ষে।

এরপর সবাই পুনরায় মাতৃ মন্দিরে উপস্থিত হলাম। আমি এবং আমার মাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে ভীষণ ভালোবাসি। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আমার প্রাণ গোবিন্দ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মহানন্দে কোলে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ কে দেখেই আমার অন্তর তৃপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণের সঙ্গে মান- অভিমানের পালার বদল ঘটেছে।

হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঢেলে, মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে মুগ্ধ নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছি গোবিন্দের নয়ন পানে। আমার আঁখি তটে কৃষ্ণ প্রেমের প্লাবন দেখা দিল। সমগ্র সত্ত্বা ডুবে গেলো, কৃষ্ণ প্রেমের অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেলো। কৃষ্ণ প্রেমের এমন মাধুরী, যা শুধু হৃদয়ের স্পর্শে অনুভব করা যায়। যত দেখি সাধ মেটেনা। মনে হয় এ হৃদয় আরও অধিকৃত হোক কৃষ্ণের প্রগাঢ় অনুরাগে।

হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! হে প্রাণ সখা! কত কষ্টের পর আজ তোমার দর্শন পেলাম। অগাধ সমুদ্রের সমগ্র জলরাশি পান করলেও যে তৃষা মেটেনা, তোমার দর্শনে সে তৃষা মিটে যায়। তোমার দর্শন বিনা যে নয়ন জ্যোতিঃশূন্য মনে হয়, আজ সে নয়ন সার্থক হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের যুগল দর্শন সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।

এরপর শ্রীমা সারদা দেবীর মন্দির ও রানী রাসমণির মন্দির দর্শন করলাম।

তারপর গঙ্গার ওপারে বেলুড় মঠে যাওয়ার জন্য স্টিমারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দেখলাম প্রায় কুড়ি- পঁচিশ জনের একটি দল খুব আনন্দ স্ফূর্তি করছে। তরুণ- তরুণী, শিশু, মাঝ বয়সী সকলের উপস্থিতি রয়েছে সেই দলে। তারা একটি বৃদ্ধা কে স্টিমারের লাইনে তপ্ত রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রেখে সবাই গাছের ছায়ায় বসে আরাম করছে, হাসিঠাট্টা করছে, আইসক্রিম খাচ্ছে, কদলীরাশি সহযোগে বাঁদরের সঙ্গে নিজস্বী গ্রহণ করছে।

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখে মন ভীষণ পীড়িত হয়েছে।

গঙ্গার ঘাটে স্টিমারের সংখ্যা অল্প। বৃদ্ধা একাকী আসতে চাইলে সঙ্গে নিয়ে কৃতার্থ হতাম, কিন্তু আমি নিরুপায় , এই কষ্টের থেকে বৃদ্ধা ঠাকুর মাকে শান্তি দিতে পারলাম না। একটু বিষণ্নতা নিয়েই স্টিমারে উঠলাম। ফেরিঘাটে অনেক মানুষের আনাগোনা। বাঁদর গুলোও গাছের এই ডাল থেকে ওই ডালে লম্ফ ঝম্ফ করছে। অনেকে তাদেরকে কলা খেতে দিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি তুলতে ব্যস্ত।

স্টিমার ছেড়ে দিলো, গঙ্গার এপারের দৃশ্য গুলো নিকট ছেড়ে দূরত্বের সীমা টেনে দিচ্ছে। একটু একটু করে অস্পষ্ট হতে শুরু করেছে এপারের লোকজন, স্নানের ঘাট, এখনও একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মাতৃমন্দির, শিবমন্দির, সবুজ বনরাজি।

পূর্বেই ব্যক্ত করেছি যে জলরাশি আমার ভীতির কারণ। কিন্তু যখন গঙ্গা পার হয়ে বেলুড় মঠের দিকে রওনা দিচ্ছিলাম, তখন প্রবল ঘূর্ণিঝড় যেমন সবকিছু কে উড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি গঙ্গার বুকে আনন্দের ঝড় আমার অন্তরের সমস্ত ভয় ও মনে জমে থাকা কালো মেঘকে নিজের অজান্তেই কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তখন গঙ্গা দেবী কে ভীষণ সুন্দর লাগছিল। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য। গঙ্গার যে পার ছেড়ে যাচ্ছি সেই পারের স্পষ্ট নবীন পাদপরাজি, গঙ্গার তীর, মন্দিরের আকর্ষণ, স্নানের ঘাট প্রভৃতির সাথে ওপারের আলোছায়া তে দেখা বেলুড় মঠের মন্দির, বনানী ঘেরা গাঢ় সবুজ রেখার সাথে মন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

নবাগত হেমন্তের শুভ্র মেঘপুঞ্জ যেন মাঝে- মাঝে নীলাম্বরী র স্নিগ্ধ আঁচলের কোমল রেখা ভেদ করে গঙ্গার এবং তার চারিধারের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে আড়াল আবডাল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে। আমিও ভীষণ মুগ্ধ, আনন্দে উৎফুল্ল। মাঝে- মাঝে গঙ্গা বারি মাথার ও মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বাল্যকালীন সারল্যপূর্ণ শিশুর ন্যায় আনন্দ উপভোগ করছিলাম। মা আমার এই অহেতুক দুষ্টুমি দেখে ভয় পাচ্ছিলেন, বোধহয় রাগ ছিল না তখন। কিন্তু এই একটুখানি দুষ্টুমি করতে পেরে আমার আনন্দ অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর রৌদ্রতপ্ত দিনের রুক্ষতা হতে মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলাম।

গঙ্গার শীতলতা বাতাসে মিশে এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা চঞ্চল, অস্থির ব্যক্তি ও এই শীতলতার ছোঁয়া পেলেই শান্ত হয়ে যাবেন।

মাতৃ সমীপে উপবেশন করে আমিও উপভোগ করেছি গঙ্গার মনোমুগ্ধকর শীতল সমীরণ, স্নিগ্ধতা, সারল্যপূর্ণ আকর্ষণ, পবিত্র স্পর্শ, শুভ্র মেঘাচ্ছন্ন উন্মুক্ত নীলাম্বর, রৌদ্র ঝলমলে গঙ্গার তীর...... এ সৌন্দর্য জীবনে কখনও ভুলবোনা। এক নিমেষে মনটা হারিয়ে গেলো সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা ' উপন্যাসের সেই যুবার বর্ণনাচ্ছটায়-

'আহা! কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরে ও ভুলিব না।'

" দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী

তমালতালীবনরাজিনীলা।

আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-

র্দ্ধারানিবদ্ধের কলঙ্করেখা।।"

বেলুড় মঠে এসেই মাকে বললাম আঃ! কী দারুণ...... শান্তি লাগছে মা! এখানে এসেই অনেক মন্দির দেখলাম। মা গঙ্গার স্রোতে আমাদের সৌভাগ্যের সময় টা বোধকরি খানিকটা বয়ে গেছে। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। তবুও যেটুকু আনন্দ পেয়েছি তা কাউকে বোঝানোর জন্য খাতা, কলম, ক্যামেরার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র একটা সুন্দর মন ই যথেষ্ট।

শ্বেত পাথরে নির্মিত স্বামীজীর মন্দিরের নিকটে গিয়ে প্রণাম করলাম, এখানে দ্বার উন্মুক্ত ছিল তাই প্রবেশ করতে পেরেছি। সর্বদা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এমন স্থানে ভ্রমণ করা। সেই চাওয়া আজ সফল হয়েছে। গঙ্গা তীরের শ্বেত পাথরের মন্দিরে এমন শীতলতা, এমন প্রশান্তি পাবো এ ছিল আমার ভাবনাতীত। হাজার বৈদ্যুতিক উচ্চ গতির পাখা চালালে অধিক বাতাস অবশ্যই প্রাপ্ত হবে কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি, এমন শান্তি পাওয়া যাবে না ।

কিছুক্ষণ পর দুর্গা মাকে দর্শন করলাম। অবশেষে প্রসাদ খেলাম। হাজার -হাজার মানুষের লাইন, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হচ্ছে মৌনব্রতের ন্যায়। অন্যান্য স্থানে দু-পাঁচ জনের সমাবেশ ঘটলে কত হই-হল্লা, চিৎকার, চেঁচামেচি কিন্তু এখানে? এতো জনসমাগমেও সর্বদা ই শান্তি বিরাজমান।

" যস্মিন্ দেশে যদাচরেত্।"

এখানকার পরিবেশ খুব সুন্দর, মনোরম। সকল মানুষ এখানে আগমন করে আপন আপন দুঃখ ব্যক্ত করেন, আর একরাশ প্রশান্তি নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানকার মাটি প্রতিটি মূহুর্তে প্রতিটি ব্যক্তি ও বস্তু কে শিক্ষিত করে তোলেন। নম্রতা, ভদ্রতা শেখাতেই মা গঙ্গা, মা ভবতারিণী, মা সারদা স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। দূর দূরান্ত থেকে যে সন্তান রা ছুটে আসে সমস্ত দুঃখ, গ্লানি ভুলতে, তারা যেন নিরাশ না হয়। মাতৃক্রোড়ে মাথা রেখে স্নেহ মাখানো আঁচলের শান্ত বাতাসে যারা মন ভরাতে আসে তাদেরকে তোমরা একটু শীতল বাতাস ও শান্ত ছায়া প্রদান করো।

এখনকার মৃত্তিকা ই তাদের মায়ের কোল, শান্তির নীড়, ক্লান্ত পথিকের পরম মোক্ষ গঙ্গা তীরের মৃদু সমীরণ, বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের পরম প্রিয়।

মাতা যেন গগন পানে তাকিয়ে বার্তা প্রেরণ করছেন, অথবা সন্তানের সুখের জন্য সূর্যদেবের নিকট করুন আর্তি জানাচ্ছেন । হে সূর্যদেব! তুমি লেলিহান শিখা সম পোষাক পরিত্যাগ করো। হে পুঞ্জীভূত মেঘমালা শুভ্র বলাকার ন্যায় বেশ ধারণ করো, তাহলে আমার সন্তান রা ঝলসানো সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবে।

ধীরে ধীরে বিদায় লগ্ন উপস্থিত। প্রবাসী সন্তানদের বিদায় জানাতে মাতৃ হৃদয়ে বিষন্নতা দেখা দিল। মা যেন বলতে চাইছেন ওরে আর কটা দিন থেকে যা। আবার কবে আসবি বাছা? মাতা গঙ্গা দু বাহু প্রসারিত করে যেন বলছেন তোরা এখন ই চলে যাবি? আর একটু থাকনা আমার কাছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নসরসী। ফিরতে চায় না মন, তবুও ফিরতে হবে। গঙ্গা তীরের ঐ লম্ফ ঝম্ফ করা বানর গুলির চোখেও একই আর্তি ফুটে উঠেছে। কী বিস্ময়কর দৃশ্য, না বলা কথাগুলি যেন তাদের করুণ চাহুনিতে ব্যক্ত করছে।

জগজ্জননী মা ভবানীর কাছে বিদায় নিলাম।

অপার আনন্দের মধ্যে সময়টা যেন খরস্রোতা নদীর ন্যায় দ্রুত গতিতে বয়ে চলেছে। যথা সময়ের পূর্বেই যেন বিদায় লগ্ন দ্বারে উপস্থিত হয়ে কড়া নাড়ছিল। অবশেষে আমার পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিদায়ের প্রার্থনা করে অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম।

***

চিত্র শিল্পীঃ**রোমিতা দাস**

ঠাকুর দেখা মানেই ১১ নং

পল্লবী সান্যাল

সভ্যতা শুরুর দিকে যখন গাড়ি ঘোড়া কিছু ছিল না, ছিল শুধু ১১ নং। ঠিক সেরকমভাবেই অনেকের কাছেই পুজো পরিক্রমা মানে ১১ নং। যেমন এ পাড়া থেকে সে পাড়া, ওমুকের পুজো থেকে তমুকের পুজো, হেঁটেই সবটা কভার করে ফেলে গুড্‌ডু – দিয়া – রিয়া – বাবাইরা। এমনি সময়ে হাঁটতে ইচ্ছা না করলেও বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে ঠাকুর দেখার মজাই আলাদা। সেবার ঠিক হল সপ্তমীর বিকেলে বেরোবে চারমূর্তি। এমনিতেও পুজোর সময় যা যানজট হয় ১১ নং ই ঠিকাছে। এই ভেবে সেরা পুজোগুলোর স্বাদ আস্বাদন করতে যাত্রা হল শুরু। চারজন কাছাকাছিই থাকে। ফলে স্টার্টিং পয়েন্ট আর ফিনিশিং পয়েন্ট নিয়ে খুব একটা সমস্যা হয় না। হাঁটা শুরু হল। কিছুটা যেতেই এল প্যান্ডেল। লম্বা লাইন। এই একটা ঠাকুর দেখতে গিয়েই তো রাত হয়ে যাবে। সময় মতো বাড়ি না ফিরলে কপালে দুঃখ আছে, বলে উঠল দিয়া। বাকিদেরও যে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই তা নয়। সবার মা-ই ঘরে ফেরার টাইম বেধে দিয়েছে। কী হবে এবার? তাহলে কি ঠাকুর দেখব না? বলে উঠল গুড্‌ডু। বাবাই বলল আইডিয়া। আমরা চল ফিরে যাই। পাড়ার প্যান্ডেলে বসে ভার্চুয়ালি ঠাকুর দেখি। ধুস! ভার্চুয়ালি আবার ঠাকুর দেখা যায় নাকি। রিয়ার কথায় বাবাইয়ের উত্তর, তাহলে চল। মায়ের বকুনির হাত থেকে বাঁচবি তো? এই করে ষষ্ঠী অতিক্রান্ত।

সপ্তমীর সকাল। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৭ টা। চারমূর্তির হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের নোটিফিকেশনটা বেজে উঠল। কি রে কটায় বেরোবি? সেন্ডার গুড্‌ডু। বাবাইয়ের রিপ্লাই, কালকের মতো দেরি করিস না। সকাল সকাল বেরোলে ঠাকুর দেখা যাবে। নয়তো আবার ওদের বাড়ি ফেরার তারা। ঠিক হল ১২ টায় ঠাকুর দেখতে বেরনো হবে। দুপুরের খাওয়া দাওয়াও

একসঙ্গে। যে যার বাড়িতে পারমিশন নিয়ে বেরলো। আগের দিন কিছুটা হলেও দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুর দেখা হয়েছে। এবারে তাই যাওয়া উত্তর কলকাতা। ঠিক হল কলেজ স্কোয়ার, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, চালতা বাগান লোহাপট্টি, কুমোরটুলি সর্বজনীন, বাগবাজার সর্বজনীনের ঠাকুর দেখা হবে। দুপুরে রেস্টুরেন্টে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে পেট পুজো করতে করতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ফলে সব ঠাকুর আর দেখা হয়ে ওঠেনি। তার ওপর খাওয়া দাওয়ার পর কি আর হাটা যায়? সন্ধ্যায় তাড়াতাড়িই তাই ফিরে এসেছিল গুড্‌ডু – দিয়া – রিয়া-বাবাইরা। তবে না। ঘরে ঢুকে পড়েনি তারা। পাড়ার মন্ডপেই আড্ডা চলল রাত ১০ টা পর্যন্ত।

দিনের বেলা ঠাকুর দেখেও মন ভরেনি বাবাইয়ের। লাইটিং দেখার ইচ্ছা ছিল খুব। সে আর হল কই। এই ভেবে মন খারাপ তার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রিয়া বলল, মন খারাপ করিস না। আমরা কত আনন্দ করলাম বলতো এই দুদিন। কাল মহাষ্টমী। জানিসই তো বাড়িতে রান্না

পুজোর ব্যাপার আছে। কাল তোদের সঙ্গে বেরনো হবে না। আজ চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে নিই। পুজোর পর আবার পড়াশোনা, গানের ক্লাস এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাব।

ষষ্ঠী, সপ্তমী অতিক্রান্ত । হাতে রইল অষ্টমী, নবমী। অষ্টমী নবমীর দিনগুলি বাবা মায়ের সঙ্গে আর দশমীতে ঠাকুমার বাড়ি যায় রিয়া। বাকিরাও যে যার মতোই কাটায়।

অষ্টমীর সকাল। অঞ্জলি শুরু হবে হবে। গুড্ডু – দিয়া – রিয়া – বাবাইয়ের গ্রুপ চ্যাটে তখন মহাষ্টমীর শুভেচ্ছা বার্তার আদান প্রদান চলছে।

ওদিকে দিয়া আর রিয়া মোটেই রেসপন্স করছে না। তবে মেসেজ সিন করছে। বাবাই গ্রুপে টেক্স করল, কেস টা কি হল! মেয়ে দুটো করছে কি? গুড্ডুর রিপ্লাই, তুই এখনও বুঝতে পারলি না? মহাষ্টমী বলে কথা। নিশ্চয়ই সাজ-শাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। একথা শুনে বাবাই ফের টেক্ট করল, তোদের সাজগোজ হলে একটা পিক দিস। আজ তো আর একসঙ্গে বেরনো হবে না। পারলে ভার্চুয়ালি মিট করিস ফ্রি হলে। নো রিপ্লাই । বিকেলে স্যোশাল সাইটে একে একে সবার স্ট্যাটাস আপলোড হচ্ছে। বাবাই আর গুড্ডু ওদের বাকি বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে ছবি তুলেছে। ক্যাপশানে লেখা - - মহাষ্টমীর ভুরিভোজ। এই দেখে রিয়ার কমেন্ট মহাষ্টমী মানে বাড়ির রান্না। ওদিকে দিয়া একটা ছবি পোস্ট করে লিখেছে, মেয়েরা সবসময় সাজতে ব্যস্ত থাকে না। কখনও কখনও মায়ের শাড়ির কুঁচি ধরতেও ব্যস্ত থাকে। মোটের ওপর পোস্ট লাইক কমেন্ট করেই কেটে গেল অষ্টমী। নবমীও যার যার মতোন কাটল। পুজো প্রায় শেষ। বিজয়া দশমীতে প্রতিবারের মতো ঠাকুমার বাড়ি বেড়াতে গেল রিয়া। লক্ষী পুজো কাটিয়ে তারপর আসবে। ঠাকুমার বাড়ি মেদিনীপুরে। গ্রামের বাড়িতে ঠাকুমা ছাড়াও কাকা জেঠা সবাই আছে রিয়ার। বিজয়ার প্রণাম সেরে মোবাইলের দিকে মন গেল তার। ঠাকুমা বলে উঠল, কী করিস? আয় না একটু কাছে এসে বস। গল্প শুনি। সারা পুজোয় কি করলি। রিয়াও বলতে শুরু করল। প্রচুর হেটে যে পায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছে সে কথাও শোনাল। ঠাকুমা বলে, তোদের মত যখন ছিলাম আমরাও ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতাম। সেই সময় না ছিল টোটো আর না ছিল অটো। পায়ে হেটেই গোটা গ্রাম ঘুরতাম। ন পাড়ার আমবাগানটা পেরিয়ে সোজা খানিকটা গেলেই রায় দের

বিশাল বড় একটা মাঠ আছে। সেই মাঠেই পুজো হয়। সেসব দিন কী আর ভোলার! আজও চোখে ভাসে। রায়দের মাঠে এখন আর যাও না?

রিয়ার প্রশ্নে চোখ ছলছল করে ওঠে ঠাকুমার। বলে, আগে পায়ে হেটে ঠাকুর দেখতাম আর এখন হুইল চেয়ারে বসে। আমি বেরলে আরেকজনের খাটনি। এতটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এই বয়সে আর কাউকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চাই না। তার চেয়ে তুই বরং আমায় গল্প শুনিয়ে যাস এসে। এতেই আমার শান্তি।

***

মেলার প্রাপ্তি

সুস্মিতা সাহা

গত মঙ্গলবার গ্রামের হাটে দেখা হতে সুবল খুড়ো বলেছিল, " বারোদোলের মেলা তো শুরু হতে চলল... কিরে কমল... যাবি নাকি সেখানে?"

প্রস্তাব শুনে কমল তো এক কথায় রাজি। সে কখনো মেলার কথা শুনে না বলতে পারে! তার ওপরে বারোদোলের মেলা বেশ কিছুদিন ধরেই চলে, অনেকদিন কাটানো যাবে মেলাতে, রোজগারও নেহাত মন্দ হবে না... ভেবেই খুশি হয় সে।

সারাবছর নানান জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন মেলায় গিয়ে জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসাটা কমলের পেশা-নেশা দুটোই। তার খুব ভালো লাগে মেলার হৈ-হট্টগোল, অত মানুষের আনাগোনা, তাদের খুশি-আনন্দ। তাদের খুশি দেখে সেও খুশি হয়ে কাটিয়ে দেয় দিন কটা। তার দিন, বাড়িতে কম মেলায় মেলায় কাটে বেশি। কি-ই বা করবে সে! কোনো পিছুটান তো নেই যে বাড়ি ফিরে আসতেই হবে দিনের শেষে। অনাথ যুবক সে। বাপকে তো মনেই নেই, মা-কেও হারিয়েছে সেই ছোটবেলায়। কাছের বলতে আর কেউ নেই। গরীবের কি আর কাছের মানুষ থাকে! তাই মেলাই সব তার, সেখানেই আনন্দ।

নির্দিষ্ট দিনে মেলায় পৌঁছে সে আর সুবলখুড়ো, ডেরা জমায় একটা যুতসই জায়গা দেখে। সুবলখুড়ো কাঠের নানান জিনিসপত্র বিক্রি করে, আর কমলের প্লাস্টিকের হরেক জিনিসপত্রের সম্ভার। প্রথম দু-তিনদিন একটু ফাঁকায় কাটলেও ধীরে ধীরে বেশ জমে ওঠে মেলা। বিক্রিবাট্টাও বেশ ভালোই হয়। দোকানে খরিদ্দার না থাকলে সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে মেলায় আগত মানুষজনের আমোদ,আনন্দ, বাচ্চাদের নাগরদোলা চড়ার খুশি, এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া। পরিবার নিয়ে সবাই কত আনন্দ করে মেলায় আর সেসব দেখে মনে মনে আনন্দ পায় সে। তার জীবনে কি আর এরকম দিন আসবে কখনো!....ভাবে এক এক সময়।

মেলার এইরকমই এক ব্যস্ত সন্ধেয় কমল লক্ষ্য করে একটি অল্পবয়সী মেয়ে প্রায় উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু যেন খুঁজছে। কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকে সে। কাছে আসতেই লক্ষ্য করে মেয়েটির কাঁদো কাঁদো অবস্থা। বিচলিত হয় সেও। জানতে উদগ্রীব হয় কী হয়েছে তার! কিন্তু অনেকবার জিজ্ঞেস করেও কোনো সদুত্তর পায় না শুধু অশ্রুধারা ছাড়া। সে অনুমান করতে পারে মেয়েটি হয়তো হারিয়ে গেছে নিজের লোকের থেকে। সদ্যযৌবনা মেয়ে... কত

বিপদ চারিদিকে... এই ভেবে সে মেয়েটিকে নিজের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখে আর অপেক্ষা করে মেয়েটির বাড়ির লোকের খোঁজ পাওয়ার।

ধীরে ধীরে মেলার ভিড় কমে এলেও তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না। ওদিকে মেয়েটির অবস্থাও কঠিন ভয়ে আর উৎকণ্ঠায়। কমল কী করবে ভেবে পায় না, আবার মেয়েটিকে কাছ ছাড়া করতেও মন চায় না এত রাতে। সুতরাং মেয়েটি তার কাছেই আশ্রয় নেয় রাতটুকু। কমল ভাবে কাল ঠিক আসবে তার বাড়ির লোক তাকে খুঁজতে.... মেয়েটিকে তাদের হাতে তুলে দিতে পারলেই তার ছুটি। কোনোরকমে রাতটুকু পার হয় বিনিদ্রভাবে। সকালে মেয়েটিকে নাম জিজ্ঞেস করতে গিয়ে অবাক হয় কমল। মেয়েটি হাবেভাবে জানায়, সে কথা বলতে পারে না। কমলের দোকানে থাকা কতগুলো প্লাস্টিকের গোলাপের দিকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেয় তার নাম গোলাপ। কমলের হৃদয় আর্দ্র হয়। ভালো করে দেখে তাকে। এত সুন্দর, মায়াময় মুখ মেয়েটির, সাথে দুটো আকর্ষণীয় চোখ... ভাবতেই কষ্ট হয় সে বোবা।

দিন কেটে সন্ধে হয়। গোলাপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে তার বাড়ির লোকের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হয়। এভাবে দুদিন যেতেই কমল বুঝতে পারে যে মেয়েটি আসলে হারিয়ে যায়নি, বোবা মেয়ের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতেই হয়তো মেলার ছলনার আশ্রয় নিয়েছে বাড়ির লোক, কে জানে হয়তো বা মেয়েটির নিজের লোক নয় তারা, কোনো মা-বাবা তো পারেনা এভাবে তার সন্তানকে ত্যাগ করতে সে যেমনই হোক না কেন! এদিকে সুবল খুড়োও চিন্তান্বিত হয়, কমলকে সাবধান করে যে একজন সোমত্ত মেয়েকে নিয়ে এই অচেনা অজানা জায়গায় শেষে বিপদে না পড়তে হয়! কমলও বোঝে সে কথা কিন্তু এই অবস্থায় ছেড়ে দিলে মেয়েটা যদি কোনো বিপদে পড়ে সেই আশঙ্কায় তাকে ত্যাগও করতে পারে না।

এরপর যত দিন যায় কমল দেখে গোলাপের চোখ থেকেও যেন সেই অপেক্ষার দৃষ্টি উধাও হয়ে গেছে, হয়তো সেও বুঝে গেছে তার ভবিতব্য। গোলাপ যেন তাকেই আঁকড়ে ধরতে থাকে এক পরম নির্ভরতার আশ্রয় হিসেবে। ইশারায় হলেও সে আজকাল বেশ ভালোই বোঝাতে পারে কমলকে তার সব কথা। এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে তারা। কমলও আজকাল এক অবর্ননীয় আকর্ষণ অনুভব করে গোলাপের প্রতি।

আজকাল আর কমলকে রান্না-খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না, কমল আর সুবল খুড়োর সব দায়িত্ব যেন অজান্তেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে গোলাপ। কমল আজকাল শুধু দোকানের বিক্রি-বাট্টাতে মন দিয়েছে। যেন এক অলিখিত সংসার গড়ে উঠেছে তাদের, মেলার পরিসরেই। কমল ভাবে এটাই কি তবে ভালোবাসা! মা চলে যাবার পর আর কারো তেমন সাহচর্য পায়নি সে,

ভালোবাসা তো দূর! তাই জানে না আসলে ভালোবাসা ঠিক কাকে বলে কিন্তু এখন তার দিন যেভাবে কাটছে সেটাকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় সারাজীবন। সুবলখুড়োও আজকাল গোলাপকে খুব স্নেহ করে, উনিও যেন ওকে মেনে নিয়েছেন পরিবারের অংশ হিসেবে।

কমল ভাবে, মেলা শেষে গোলাপকে সঙ্গে করেই ফিরে যাবে গাঁয়ে। বিয়ে করবে তাকে। দু'জনে গুছিয়ে সংসার করবে। আয়ও বেশ ভালোই হয়েছে এখানে, কোনো অসুবিধা হবে না। দু'জনের বেশ ভালোই কেটে যাবে। গ্রামের হাট তো আছেই।

মেলার শেষ দিনে কমল নিজের দোকান সাজায় না। আজ সারাটা সন্ধে সে শুধু গোলাপের সাথে মেলা ঘুরবে, আনন্দ করবে সবার মত। দুজনে মিলে এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে ফুচকা খায়, আইসক্রিম খায়, জিলিপি, সিঙ্গারা খায়, গোলাপকে তার পছন্দের চুড়ি, টিপের পাতা, জামাকাপড় কিনে দেয়। দু'জনে হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়ায় পুরো মেলা। কমল আজ খুব খুশি, তার প্রিয় মেলা আজ তাকে জীবনের পরমপ্রাপ্তি মিলিয়ে দিয়েছে, সে খুঁজে পেয়েছে ভালোবাসাকে, তার জীবনসঙ্গিনীকে।

***

চিত্র শিল্পীঃ **রোমিতা দাস**

তৃণা

গোপা দাস

কি রে ঘুমিয়ে পড়লি? কতবার বলেছি রাতে শোয়ার আগে ক্রিমটা মেখে ঘুমো। তুই তো আমার কথা শুনবি না ঠিক করেছিস! মা তো তোর শত্রু!

মা, রোজ রোজ ভালো লাগে না। আমি মাখতে চাই না। আমায় ঘুমাতো দাও।

হ্যাঁ ঘুমো। আর আমি চিন্তায় দু'চোখ খুলে রাখি। কী করে যে তোর বিয়ে হবে, জানি না।

বিয়ে করার জন্যই কি আমি জন্মেছি! আর কিছু করার নেই আমার!

যা পারিস কর। আমি আর কিছু বলব না। রোজ রোজ তোকে এককথা বলতে আমারও ভালো লাগে না।

আমারও রোজ রোজ তোমার মুখে কালো কালো শুনতে ভালো লাগে না। দেখবে একদিন যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।

মা আর মেয়ের এই বাক্যলাপ নতুন নয়। তারা এখন এগুলো বলতে একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবে বলতে অভ্যস্ত হলেও কষ্টে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। মার চিন্তা কালো মেয়ের বিয়ে হবে কিরে!? আর মেয়ে ভাবে গায়ের রঙের জন্য তো সে দায়ী নয়। তাহলে তাকেই কেন কথা শুনতে হবে!

একদিন মা আর মেয়ের মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। তৃণা মানে মেয়েটি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যায়। কোথায় যাবে, কী করবে কিছুই জানে। শুধু বেড়িয়ে পড়া। এই জীবন রাখতে চায় না সে। রাস্তা দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে চলছে। হঠাৎ কানে ভেসে এলো তার নাম। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। পিছনে ফিরে দেখে একটি সুদর্শন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ রেখে তৃণা মোহিত হয়ে যায়। মূহুর্তের আলাপ প্রেমে পরিণত হয়। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। তৃণা কী করবে বুঝতে পারে না। ভাবে ছোট থেকে এই বিয়ের জন্য এতো গঞ্জনা শুনতে হয়েছে। আজ সেই বিয়ের প্রস্তাব তার কাছে নিজে হেঁটে এসেছে। সে ফেরাবে না। গ্রহণ করবে।

তৃণা রাজীবকে বিয়ে করতে সম্মতি জানায়। এরপর একটি মন্দিরে গিয়ে দু'জনে বিয়ে করে। বিয়ের পর রাজীবের সঙ্গে তার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। খুব খুশি তৃণা। সে মাকে বলতে চায় তার বিয়ে হয়েছে। আর চিন্তা করো না। তৃণার মনে হচ্ছিল তখনই ছুটে গিয়ে মাকে জানায় কিন্তু রাজীব কী ভাববে বুঝতে না পেরে চুপ করে যায়। রাজীব তৃণাকে বেডরুমে নিয়ে যায়। বেডরুম খুব সুন্দর। রাজীব যে কতটা শৌখিন তা বেডরুম সাজানো দেখে বোঝা যাচ্ছে। তৃণা ভীষণ খুশি রাজীবকে পেয়ে।

তৃণার চোখে পড়ে বেডরুমের একধারে একটি আয়নার উপর। সেটা চাদর দিয়ে ঢাকা। তৃণা চাদর সরায়। পিছনে এসে দাঁড়ায় রাজীব। তৃণা দেখে আয়নায় রাজীবের কোন প্রতিবিম্ব নেই। ভয় পেয়ে নিমেষে ঘুরে যায় তৃণা। দেখে রাজীব একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে আর চোখে ভয়াল ক্‌রুরতা।

***

চিত্র শিল্পীঃ **পৌলমী নিয়োগী**(*ডিজিটাল আর্ট*)

বিজয়ধনুশ

অয়ন দাস

“আলি কুলির পান্না” কেসটার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আমার হাতেও বিশেষ কোন কাজ নেই। গত মাসে একটা আর্ট এক্সিবিশন ছিল। সেটা শেষ করে ইদানিং বাড়িতে বেকার হয়ে বসে আছি । বিজয়কে একদিন হঠাৎই প্রস্তাব দিলাম ‘এখন তোর হাতেও কোন কেস নেই, আমিও ঝাড়া হাত-পা, কাছেপিঠে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।’ ও বলল ‘একটা কেসের গন্ধ পাচ্ছি।’ আজব ছেলে সত্যি। কয়েকমাস বসে থেকে থেকে দেখছি ওর চরিত্রে কিঞ্চিৎ বদল এসেছে। নিয়ম করে এখন আর আড্ডায় আসে না। বেশ কিছুদিন রিগর মর্টিস নিয়ে পড়াশোনা করল। এখন দেখছি মন মজেছে নানারকম বিষ ও তার ব্যবহারে। এই কয়েক মাসে মুচিপাড়া থানার দুটো চুরির কেসে ওসিকে সাহায্য করেছে, অবশ্য এক্সিবিশনের জন্য দুটোর কোনোটাতেই ওর সাথে আমি থাকতে পারিনি। এবার যখন ও কেসের গন্ধ পাওয়ার কথা বলল তখন আর সুযোগ ছাড়তে পারলাম না। অবশ্য শুধু রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চারই নয়, ওর সাথে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়। ওকে বললাম ‘আগের দুটোয় কিন্তু আমি ছিলাম না, এবার কেস এলে আমি কিন্তু থাকছি। ’ ও দেখলাম বেশ মাথা নেড়ে সিগারেটটা ধরাল।

আমাদের কথোপকথন যখন চলছে, ঠিক তখনই বিজয়ের মোবাইল বেজে উঠল, ফোনের এপার থেকে বিজয় যা বলল তা হল ‘কখন? কোথায়? আসছি।’ ফোনটা রেখে ও বলল ‘শঙ্কর মামার ফোন। লেকগার্ডেন্সে একটা খুন হয়েছে। প্রমথেশ দত্ত, দত্ত জুয়েলারি হাউসের মালিক। শঙ্কর মামা একবার যেতে বলল।’

তো আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হয়ে বললাম ‘বেশ তো, চল তাহলে। ’ ও দেখলাম একটা বাঁকা হাসি হেসে বলল ‘ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মাই ডিয়ার ওয়াটসন।’ সত্যি এটা কিন্তু মিলিয়ে দেখিনি। কি অদ্ভূত সংযোগ, পাঁচ মিনিট আগেই ও বলেছিল একটা কেস আসতে চলেছে আর এখন পাঁচ মিনিট পর সত্যি সত্যিই বিজয়ের হাতে কেস। আপাতভাবে তদন্তকারী অফিসার যেই হোক না কেন, কেসটার অলিখিত ইনচার্জ এখন বিজয়। কারণ যুগ্ম-কমিশনার (অপরাধ)-এর হাত রয়েছে বিজয়ের মাথায় - তিনি শঙ্কর মণ্ডল, বিজয়ের আপন মামা।

সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন থেকে রবীন্দ্র সরোবর নেমে সেখান থেকে লাগোয়া রাস্তায় পনেরো – বিশ মিনিট হাঁটলে যে এলাকা পড়বে, সেটা শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকা, বিশ্বায়নের যুগে যেখানে এসব এলাকায় পেল্লায় ফ্ল্যাট বাড়ি আর রেসিডেনশিয়াল হাউজিংয়ের আধিক্য সেখানে প্রকাণ্ড একটা বাড়ি যে থাকতে পারে সেটা রীতিমত অবিশ্বাস্য। বাড়িটা খুঁজে পেতে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হল না। বাড়িটার সামনে পৌঁছে দেখি পুলিশের একটা ভ্যান এবং একটা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে এক কনস্টেবল। বিজয় তাকে আমাদের পরিচয় দিতে কনস্টেবল আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সেখানে যার সাথে আমাদের প্রথম আলাপ হল বুঝলাম তিনি ই এই কেসের তদন্তকারী অফিসার ধূর্জটি সেন| ধূর্জটি সেন যে আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন তেমনটা বলা যাবেনা, বুঝলাম আমাদের অহেতুক আগমনে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তই হয়েছেন| অবশ্য সেটা মুখে প্রকাশ করলেন না, বললেন ‘আপনিই তাহলে বিজয় বাবু?’ বিজয় অল্প মাথাটা নেড়ে সায় দিল|

'আপনার আসার কথা স্যার বলেছেন। আসুন। '
প্রাথমিক আলাপ সেরে আমরা তিন তলার বারান্দার উত্তরদিকের ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখলাম, তা এককথায় 'সাংঘাতিক।' একটা বড় ইজি-চেয়ারে হেলানো অবস্থায় পড়ে এক বৃদ্ধ। বয়স আন্দাজ সত্তর – বাহাত্তর। তার গলায় একটি গভীর ক্ষত। রক্তে ভেসে গিয়েছে ঘরের মেঝে। বিজয় দেখলাম সোজা চেয়ারের সামনে ঝুঁকে পড়ে কীসব জানি খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।
ধূর্জটি বাবু বললেন ' ইনি প্রমথেশ দত্ত, দত্ত জুয়েলারি হাউজ এর মালিক। '
'বডি প্রথম কে দেখে?' প্রশ্ন করল বিজয়।
'রতন নামে এক কাজের লোক আছে। ও চা দিতে এসে দেখে। '
আপনার কি মনে হয় ধূর্জটিবাবু? '

যেভাবে গলা কেটেছে, পাকা খুনির হাতের কাজ। আর এ এলাকাটা মশাই রাত বাড়লে একদম নিরাপদ নয়, যতসব সমাজবিরোধীদের আড্ডা, নিশ্চয়ই চুরি করতে এসে ইন্টারসেপ্টেড হয়েছে আর তারপরই গলাকেটে মাল নিয়ে চম্পট।

'আর যদি ব্যবসায় শত্রুতা থেকে থাকে? '

'সেক্ষেত্রে চুরির অ্যাঙ্গেলটা খাটে না। '

'ঘর যেরকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখছি, তাতে কিছু চুরি হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

' মেজ বাবু বাড়ির লোকেদের সাথে কথা বলে লিস্ট তৈরি করছেন। '

'বডি পোস্টমর্টেমে কখন যাবে? '

'এইতো আপনারা চলে গেলেই পাঠাব, নিচে ভ্যান রেডি আছে। '

'চুরি করতে এসে পেশাদারী কায়দায় খুন করে কিছু না নিয়ে পালাল। '

'আপনি এতটা শিওর হচ্ছেন কি করে?'

'ওনার হাতে সোনার আংটি আর গলার চেনটা নিল না, আলমারি ভাঙল না, শুধু গলাটা কেটে চলে গেল। '

'হয়তো চুরির সুযোগ পায়নি, কেউ আসছে দেখে পালিয়েছে। '

' বটে। বাড়িতে কে কে থাকে? '

'ওই তো দুই ছেলে, তাদের স্ত্রী, নাতি-নাতনি আর মেয়ে-জামাই।'

'আর অন্য কেউ?'

'আর ওই রতন বলে কাজের লোকটা। ' 'রতনের সাথে একটু কথা বলা দরকার।'

'বেশ তো আপনি চলুন তাহলে। '

দোতলায় নেমে আমরা রতনের দেখা পেলাম। কারুর জন্য চা নিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই কিঞ্চিৎ ভয়ার্ত মুখে কাঁচুমাঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দারোগা ধূর্জটি বাবু বললেন – 'এই বাবু তোমায় কিছু প্রশ্ন করবেন।' রতন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

'তোমার বাবু কটায় ঘুমোন? 'শুরু করল বিজয়।

'বাবু তো অনেক রাত করে ঘুমাতেন বাবু।

'কেন? '

'ওনার ঘুম না আসা রোগ ছিল যে। '

'তুমি শেষবার তোমার বাবুকে কটার সময় দেখেছিল? '

'আজ্ঞে ঘড়ি তো দেখিনি। তবে ওই সাড়ে এগারোটা-বারোটা হবে।'

'বাবু তখন কি করছিলেন? '

'বই পড়ছিলেন চেয়ারে বসে।'

' তারপর? '

'তারপর বাবুকে ওষুধ খাইয়ে আমি শুতে চলে যাই। এরপর আমি আর কিছু জানি না। '

'তোমার বাবু কেমন মানুষ ছিলেন? '

'খুব ভাল লোক ছিলেন। মাইনে পত্তর ঠিকঠাক দিতেন, খেয়াল রাখতেন। '

'কোনও দোষ-টোষ ছিল না? '

'এ কী বলছেন বাবু? ' সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন।'

'শেষ প্রশ্ন, তোমার বাবুর সাথে কে বেশি সময় কাটাতো? মানে বাবু কাকে বেশি ভালবাসেন? '

'রুমকি দিদিমণি আর চিনু দিদি। '

'এরা আবার কারা? '

'ওই শ্রীপর্ণা দেবী আর নন্দনার কথা বলছে মনে হয়।' বললেন ধূর্জটিবাবু। রতন মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল। বিজয় অতঃপর নিজের পকেট ডাইরিটা শার্টের বুক পকেটে চালান করে বলল 'তুমি এখন আসতে পারো রতন।' রতনকে প্রশ্ন করা শেষ হলে আমরা দোতলার বৈঠকখানায় এসে বসলাম। বিজয় নিজে একটা ফ্লেক ধরিয়ে ধূর্জটিবাবুকে একটা অফার করে বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে কোণে রাখা চেয়ার টেনে বসল

'কী বুঝছেন বিজয়বাবু?' বললেন ধূর্জটিবাবু

'ছকটাই আসল ধূর্জটিবাবু। ওটা মিলে গেলে উত্তর মিলতে বাধ্য। '

'আচ্ছা, প্রমথেশ দত্তের কোনও উইল ছিল? '

'খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। আর কিছু? '

'হাতের চুরুটটা আধপোড়া হয়ে হাতেই আটকে আছে। ঘরদোড় সাজানো গোছানো পরিষ্কার। '

'কিছু বললেন? '

আমি থাকতে না পেরে বললাম 'চুরি যে হয়নি সেটা তুই বুঝছিস কী করে? '

'কেউ চুরি করতে এসে কোনো দামি জিনিস না নিয়ে চলে যায়? '

'হয়তো অন্য কোনো দামি জিনিস ছিল এ ঘরে।, আমরা তো জানি না। '

'নাহ কেসটা ঠিক জমছে না। '

আমি অন্য একটা কথা মনে পড়ায় বলতে যাচ্ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বিজয় আমাকে আটকে বলল 'ধূর্জটিবাবু, প্রমথেশবাবুর পরিবার সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিতে পারেন? '

'নিশ্চয়ই। সবার সাথে কথা বলবেন? পাঠাব? '

তাহলে তো ভালই হয়। ডাকুন তাহলে। '

'বেশ আমি পাঠাচ্ছি এক এক করে। 'বলে ধূর্জটিবাবু দত্তবাড়ির অন্য সদস্যদের তলব করতে গেলেন।

বিজয় হঠাৎ বলে উঠল 'নতুন কী সিনেমা লেগেছে রে?'

'সেটা তো চয়েসের উপর নির্ভর করছে। বাংলা না হিন্দি? '

বিজয় ঘরে রাখা সোফায় গা এলিয়ে বসে বলল 'বাঙালির ছেলে, বাংলা ভালো। '

'মিত্রাতে মরীচিকা লেগেছে। ম্যাটিনি আর ইভিনিং। '

'কি সুন্দর অন্ত্যমিল মিত্রায় মরীচিকা।'

বিজয়ের এই কথায় আমরা দুজনেই হাসছিলাম। হঠাৎ একটা মধ্যবয়স্কা মহিলা চায়ের ট্রে হাতে সহসা দরজায় এসে কখন দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ্য করতে পারিনি। উনি বললেন 'একটু ভিতরে আসতে পারি? '

বিজয় বলল 'আসুন।'

'নমস্কার। আমি শ্রীপর্ণা লাহিড়ী। প্রমথেশ দত্তের মেয়ে।'

ওনার পরিচয় পেয়ে ও আমাদের পরিচয় দিয়ে ভদ্রমহিলাকে বসার একটা জায়গা দিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করল বিজয়। বিজয়ের প্রশ্ন করার সময়ই দেখলাম শ্রীপর্ণাদেবী অন্য মনস্ক ও শোকবিহ্বল। তাঁর বাবার প্রসঙ্গ এলেই চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠছে। বাবার মৃত্যুটা সহজভাবে নিতে পারেনি। একটা আড়ষ্টভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

'আপনার বাবা আপনাকে ভালবাসেন? '

'ভাই-বোনেদের মধ্যে আমি সবার ছোট, তাই খুব আদরেরও। বাবা আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু সকালে যখন দেখলাম...' কথা শেষ করতে পারলেন না, উনি তার আগেই কেঁদে উঠলে।

'কিছু মনে করবেন না। এই সময় আপনাকে বিরক্ত করছি। কিন্তু উপায় নেই। '

'না, না। বলুন না আপনি কী জানতে চান? '

'এ বাড়ির রান্না কে করে? '

'লোক আছে। এসে রান্না করে দিয়ে যায়। '

'আপনি আপনার বাবার কাজ করতেন? '

'বাবার সব কাজই আমি করতাম। শেষের দিকটা একটু খিটখিটে হয়ে গেছিলেন তো, চাকর-বাকরদের খুব একটা অ্যালাউ করতেন না। '

'আপনি আপনার বাবার ঘরে গিয়ে কী দেখলেন? '

'বাবা ওই অবস্থায় ইজি চেয়ারের উপর বসে আছেন। সারাটা শরীর আর মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছে।'

'আর কিছু? '

'না আর তো সে রকম কিছু মনে পরছে না।'

'একটু মনে করার চেষ্টা করুন প্লিজ।'

'হ্যাঁ, জানালাটা খোলা ছিল। '

'মানে?'

'বাবা সবসময় এসিতে থাকা পছন্দ করতেন। গরম সহ্য করতে পারতেন না, ঘরের বাইরেও খুব কমই বেরোতেন। সারাদিনই প্রায় এসি চলত বলে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ থাকত। কিন্তু সকালে ও ঘরের জানলা একটা দেখলাম খোলা।' বিজয়ের মাথায় ভ্রূকুটি স্পষ্ট। 'আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন? '

'সতেরো বছর।'

'আপনার স্বামী কী করেন?'

ওর একটা ইলেকট্রনিক্স গুডসের দোকান আছে চাঁদনিতে। বাবা করে দিয়েছিলেন। '

' কিছু মনে করবেন না, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। আপনি শ্বশুরবাড়িতে না থেকে এখানে থাকেন কেন?'

'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই নিশ্চয়ই?'

'একদম না।'

'তাহলে দেব না। '

'বেশ আপনার Educational Qualification টা?'

'B. A (Hons.), Political Science, আশুতোষ কলেজ।'

' অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আসতে পারেন। '

প্রশ্ন করা শেষ হলে শ্রীপর্ণাদেবীকে বিদায় দিয়ে বিজয় কে বললাম 'এটা কেমন হল? '

'কোনটা কেমন হল? '

'ওই যে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা টা জানতে চাইলি কেন? '

'অত মাথা খাটাসনি।'

আমাদের কথোপকথন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, এরই মধ্যে ঘরের ভেতর প্রকট হলেন এক সুদীর্ঘ সুঠামদেহী পুরুষ। ইনি মধ্যবয়স্ক, ফর্সা, চোখে চশমা ও গোঁফ পুরু করে ছাঁটা। ঢুকেই একপ্রকার উদ্যত ও রাগতভাবে বললেন 'আপনাদের মধ্যে বিজয়টি কোনজন?'

বিজয় নমস্কার করে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর পুরুষটি শুরু করলেন 'ওহ। তা আপনি কি পুলিশ? আপনি এসব জেরা করছেন কেন? '

'লাল বাজার থেকে এই কেসে আমায় ধূর্জটিবাবুকে সাহায্য করতে বলা হয়েছে। আমি আমার কাজটুকু করছি। জেরা নয়।'

কেন জানি না উনি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ শান্ত হয়ে পাশে রাখা একটা চেয়ার টেনে বসলেন 'বেশ তাহলে করুন। '

'প্রথমত আপনার পরিচয়টা। '

'আমি শতরূপ দত্ত। এ বাড়ির মেজো ছেলে। '

'বেশ। শতরূপবাবু আপনি কী করেন?'

' চারু মার্কেটে আমাদের দোকানের ইনচার্জ আমি।'

' আপনার সাথে আপনার বাবার সম্পর্ক কী রকম ছিল? '

'খুব একটা ভালো না।'

'কেন? '

'বাবার ধারণা ছিল আমি ব্যবসা ঠিকঠাক চালাতে পারি না।'

'আর আপনার ভাই-বোনদের?'

'দাদা নির্বিবাদী, ভালো মানুষ। আমায় খুব স্নেহ করেন। বৌদিও খুব ভালো মহিলা। আর রুমকিও খুব ভালো মেয়ে। রুমকি আমার বোন।'

'আর আপনার ভগ্নিপতি?'

এই প্রশ্ন শুনে প্রায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন 'একটা থার্ড ক্লাস ফালতু লোক। '

'কেন? ফালতু কেন!?'

'মদখোর, জুয়াড়ি একটা। আমার বোনের জীবনটা পুরো শেষ করে দিল।'

'বিয়ে দেবার আগে জানতেন না?'

'না। বিয়ের পর এসব গুনাগুন সামনে আসে। জুয়ার জন্য ওদের নিউমার্কেটের দুটো পৈত্রিক দোকানও বেচে দিয়েছে জানেন।'

'বেশ। আর কিছু?'

'এখানে এসে বাবা আর আমাদের পয়সায় খাচ্ছে।'

'আপনার বাবার কোনো উইল ছিল?'

'যতদূর জানি, না।'

'বেশ। তার মানে সম্পত্তির হিসেবটা আপনি জানেন না?'

'কি করে জানব বলুন? আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? আমায় এবার একটু দোকানে যেতে হবে।'

'আপনার বাবার কোনো শত্রু ছিল?'

'বাবা মিশতেন কোথায় যে শত্রু হবে।'

'আপনার তো একটা মেয়ে তাই না?'

'হ্যাঁ, নন্দনা।'

'আপনি রাতে ঘুমান কখন?'

'দেখুন আমি রাতে একটু নেশা করি।'

'মদ?'

'হ্যাঁ, তাই দু-পাত্র পেটে পড়লে বিশেষ হুঁশ টুশ থাকে না। কাজেই –'

'আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা?'

'কেন সেটা দিয়ে কী হবে?'

'হয়তো কিছু হবে না। তাও তদন্তের খাতিরে যতটুকু জেনে রাখা যায়।'

'ও, বি কম ফ্রম জয়পুরিয়া কলেজ।'

বকুক

'ধন্যবাদ। আপনি আসতে পারেন।'

'শতরূপবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় একপ্রকার বিজয়ের কানের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম কি বুঝলি?'

'না আছে মোটিভ আর না আছে দরকার। ওর যদি কারুর উপর রাগ থেকে থাকে তাহলে সেটা ওর ভগ্নিপতি। কিন্তু খুন হয়েছে ওর বাবা।'

'এবার যিনি ঘরে ঢুকলেন, বোধকরি ইনি প্রমথেশ দত্তের বড় ছেলে অজিতেশ দত্ত।'

'শ্যামলা রং, মোটা-সোটা চেহারা, মুখে অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট।

' আসতে পারি?'বললেন ভদ্রলোক।

'আসুন।'

'আচ্ছা দারোগা বাবু বললেন আপনারা কীসব প্রশ্ন করবেন।'

'সেরকমই ইচ্ছে আছে।'

'বেশ করুন।'

'আপনার পরিচয়টা?'

'ওহ, মাফ করবেন। নমস্কার আমি অজিতেশ দত্ত, ভিকটিমের বড় ছেলে।'

'নমস্কার, আমি বিজয় সেন। প্রথমত আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতাটা জানতে চাই।'

'এম.বি.এ।'

'কোথায় পড়তেন?'

'বি.আই. এম।'

'আপনার তো এক ছেলে,তাই না?'

'আর বলবেন না। ওকে নিয়েই তো যত অশান্তি।'

'কেন? অশান্তি কেন?'

'একদম গোল্লায় যাচ্ছে দিন দিন। রাতের পর রাত বাড়ি আসে না। আসলেও ওর মায়ের কাছে টাকা নিয়ে চলে যায়। আমি কতদিন হয়ে গেল ওর মুখ দেখিনি।'

'টাকা নিতে আসে কেন?'

'আর কী বলব বিজয়বাবু, কলেজে পড়তে পড়তে ড্রাগস আর আফিমের নেশা ধরেছে। মদ, গাঁজা তো আগে থেকেই ছিল।'

'সে এখন কোথায়?'

'জানিনা।আজ তিন দিন হল বাড়ি ফেরেনি।'

'আপনারা কোনো খোঁজ করেননি?'

'কোথায় খোঁজ করব বলুন। আমরা তো জানিই না কোথায় যায়, কী করে!'

'কী করে ও এমনি?'

'ডাক্তারি পড়ছে নীলরতনে।'

'ডাক্তারি?'

'হ্যাঁ, ওর সেকেন্ড ইয়ার হল। পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল জানেন। কিন্তু কী যে হল। বাবার সাথেও খিটিমিটি লেগেই থাকত।'

'খিটিমিটিটা কীরকম?'

'ওই বাবার কাছে পয়সা চাইত। একবার এইতো কয়েকদিন আগে, বাবার সিন্দুক থেকে পয়সা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। বাবা তো ওকে পুলিশে দেবেন বলেছিলেন। শেষটা আমাদের জোরাজুরিতে থেমে গেলেন।'

'অর্থাৎ মোটিভ স্পষ্ট।'

'আপনি কি বলছেন বিজয় বাবু?অমরেশ নিজের দাদুকে খুন করবে?'

'করতেই পারে, নেশাখোরদের ইগো বড় বিপজ্জনক হয় অজিতেশবাবু। নিজেদের অপমানের বদলা নিতে এরা যে কোনও সীমা অবধি যেতে পারে।'

' কিন্তু তা বলে খুন?'

'হ্যাঁ, খুন।আচ্ছা আপনার মা কবে মারা যান?'

'পঁচিশ বছর আগে, তারপরেই বাবা নিজেকে কেমন যেন গুটিয়ে নিতে থাকেন। ব্যবসার কাজকর্ম সব আমাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। বাইরে খুব একটা বের হতেন না বেশি।'

'আপনার বাবার সাথে শেষ দেখা?'

'কাল রাতে, কয়েকটা চেকে সই করাতে উনার ঘরে গিয়েছিলাম।'

'অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলেন?'

'না, সব স্বাভাবিক ছিল। সই করলেন, ব্যবসার খোঁজ নিলেন।'

'এসি চলছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আর জানলা?'

'বন্ধ ছিল।'

'বেশ আপনি এখন আসতে পারেন অজিতেশবাবু।'

' কী বুঝছিস ভাই?'অজিতেশ বাবু বেরিয়ে যেতে প্রশ্নটা করলাম আমি।

'অজিতেশবাবু নার্ভের রোগী। নস্যি নেন ও ছেলের প্রতি পিতার মতোই স্নেহবৎসল।'

'নার্ভের রোগী কী করে বুঝলি?'

'কারণ চেয়ারটা টানার সময় আর কথা বলার সময়ও ওনার হাত কাঁপছিল, ওনার তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে হলুদ ছোপ অর্থাৎ ভদ্রলোক নস্যি নেন। আর....'

'আর?'

' আর উনি খুনটা করেননি। একটা নার্ভের রোগীর পক্ষে ওরকম নিখুঁতভাবে অ্যাম্পুট করা অসম্ভব।

'আর?'

'অমরেশের পক্ষে এ খুন করা সম্ভব। অজিতেশ বাবুর কাছে কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও অমরেশের কাছে ছিল।'

'দাদুর প্রতি বদলা বলছিস?'

'হতে পারে, ও কিন্তু বাড়ির আনাচ-কানাচ খুব ভালো মতো চেনে। হয়তো রাত্রে কোনও এক সময়ে কাজ মিটিয়ে পালিয়েছে, দাদু মরলে অপমানের বদলা আর নেশার টাকা দুই-ই হবে এবং ভুলে যাসনি ও একজন হবু ডাক্তার। তাই মানুষের দেহ ওর কাছে খেলনা মাত্র।'

'যা কেলো, ডাক্তারির সাথে খুনের কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক অতি গভীর ভাই। গলার জখম দেখে আমার ধারণা একাজ তিনজন করতে পারে।এক পেশাদার খুনি, দুই কসাই আর তিন ডাক্তার। এক্ষেত্রে কসাইয়ের থিয়োরিটা বড্ড জোলো, তাই পেশাদার খুনি আর ডাক্তারি বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তি।

'কী মশাই কতদূর?' প্রশ্ন করতে করতে ঘরে প্রবেশ করলেন ধূর্জটিবাবু।

'এই তো চলছে। সবে তো শুরু হল।'

'কতটা কী বুঝছেন?'

'বুঝছি এ বাড়ির বংশপ্রদীপকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন।'

'কে বলুন তো?'

'অজিতেশবাবুর ছেলে।'

'ও ওই নেশাখোর টা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ সোর্স লাগাচ্ছি। আপনি মশাই এদিকটা চালিয়ে যান। মেজবাবু এখানে রইলেন, যা দরকার ওনাকে বলবেন। আমায় আবার লাশটা ময়নাতদন্তে পাঠাতে হবে।'

'আচ্ছা আপনি আসুন।'

ধূর্জটিবাবু আমাদের বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। বিজয় ঘরের এক কোণায় রাখা মাস দুয়েক আগের 'নবকল্লোল' পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগল। আমি পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে আনলক করতে যাব, ঠিক এমন সময় দরজায় টোকা দেওয়ার আওয়াজে আমরা দুজনেই দরজার দিকে তাকালাম। এক মাঝ বয়স্কা ভদ্রমহিলা। পরিচয় দিলেন সীমা দত্ত নামে, এ বাড়ির বড় বউ ও অজিতেশবাবুর স্ত্রী।

'আসুন সীমাদেবী।' বলল বিজয়।

'আমায় ডাকছিলেন?'

'হ্যাঁ, আপনার শ্বশুরের খুনের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করব।'

'বেশ তো করুন।'

'আপনি রাতে ক'টায় ঘুমোন?'

'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তারপর।'

'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তারপর কেন?'

'একান্নবর্তী পরিবার, সবকিছু শেষ করতে সময় লাগে যে।'

'বেশ। তাও আন্দাজ ক'টা?'

'দেড়টা কি দুটো বাজে।'

'আপনার ছেলের সব বৃত্তান্ত জানেন?'

হঠাৎ দেখি এ প্রশ্ন শুনে কেঁদে উঠলেন। বুঝলাম ছেলের কৃতকর্মে লজ্জিত এক মা হতাশা বর্ষণ করছেন।

'কাঁদবেন না ম্যাডাম প্লিজ। আচ্ছা সীমাদেবী, অমরেশকে আপনি শেষ কবে দেখেছেন? '

'ও কাল রাতে এসেছিল।'

'কাল রাতে?'

'হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে খায়নি কিছু সেরকম। পকেটে টাকাও নেই। বাবার ওপর রাগ করে সেই যে গেল। কতদিন ছেলেটাকে খেতে দিইনি জানেন। আর বাবা তো ওর গায়ে হাত অবধি তুলেছিলেন। এতবড় একটা ছেলে, এ বংশের ছেলে, ওর গায়ে হাত তোলাটা কী ঠিক?'

'না তা হয়তো উচিত হয়নি। কিন্তু কাউকে তো শাসন করতেই হবে, তা আপনি যেন কী একটা বলছিলেন, গায়ে হাত তোলা না কী?'

'হ্যাঁ, ওই ও বাবার আলমারি থেকে... 'একপ্রকার সীমাদেবীকে থামিয়ে বিজয় বলল, 'হ্যাঁ। চুরির ব্যাপারটা তো? জানি।'

'হ্যাঁ। বাবা ওকে হাতেনাতে ধরতে পেরে যান।'

'হুম তারপর উনি ওকে পুলিশে দিতে চেয়েছিলেন। তাই না?'

'হ্যাঁ। আমরা তারপর বাবাকে জোরাজুরি করতে উনি ক্ষান্ত হন।'

'আপনার কি মনে হয়েছিল?'

'মানে?'

'না মানে আপনার ছেলের সাথে যা যা ঘটেছিল তার আপনি বিরোধিতা করেন না সমর্থন করেন?'

'আমি কিছু জানি না বিজয়বাবু। আপনি এ ব্যাপারে আমায় কোন প্রশ্ন করবেন না প্লিজ।'

'আচ্ছা বেশ। অমরেশ কাল রাতে কখন এসেছিল?'

'ওই একটা কী দেড়টা হবে। ঘড়ি দেখিনি।'

'কতক্ষণ ছিল?'

'চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে।'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু একটা মানুষকে খুন করা যায় সীমাদেবী।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন আমার ছেলে খুনি? 'একপ্রকার রেগে গিয়ে বললেন সীমা দেবী।

'আপনি অযথা উত্তেজিত হবেন না ম্যাডাম। আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বলেছি মাত্র। অমরেশের খুন করার সুযোগ ও কারণ দুই-ই কিন্তু ছিল। '

'আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।'

'কোন মা-ই সেটা বিশ্বাস করবে না। আচ্ছা আপনার অন্য কাউকে সন্দেহ হয়?'

না, সেরকম তো কাউকে না। তবে কাল রাতের দিকে জীবনলাল এসেছিল।'

'কে জীবনলাল?'

'ডায়মন্ড মার্চেন্ট শুনেছি। মেজদার সাথেই এসেছিল। মেজদা চারু মার্কেটের দোকানটা বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে চায়, ওই জীবন লালের সাথে কী সব ব্যবসা শুরু করবে।'

'আপনার শ্বশুর কী চেয়েছিলেন?'

'বাবা রাজি ছিলেন না। ওটা এ বাড়ির লক্ষ্মী। আদি দোকান ওটা। কেউ বেচে বলুন। মেজদার সাথে তো এই নিয়ে গত সাত – আট মাস ধরে ঝামেলা চলছিল বাবার। কাল বাবার ঘর থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল।'

'কী ধরনের চিৎকার?'

'বাবা বলেছিলেন', 'আমার এক কানাকড়িও তুমি পাবে না। তোমরা সবাই আমায় ঠকিয়েছো। এসব আর কী।'

'ঠিক কী ধরনের ঠকানো বলতে পারেন?'

'আমি জানি না বিজয়বাবু।'

'আচ্ছা, এই জীবনলালকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'তা তো জানি না। তবে শুনেছি ওর জাকারিয়া স্ট্রিটে নাকি অফিস আছে।'

'অনেক ধন্যবাদ সীমা দেবী। আপনি এখন আসতে পারেন।'

কথোপকথন শেষ হতে আমরা সীমাদেবীকে বিদায় দিতে যাব, ঠিক এমন সময় দরজার পাশ দিয়ে কাউকে সরে যেতে দেখলাম। সীমাদেবী বেরিয়ে যেতে বিজয়কে বললাম, 'দেখলি?'

'রতন'

'হুম।'

'ওকে পরে ডিল করব। আপাতত ভাবনা প্রমথেশবাবু আর ঠকানো। কে তাকে ঠকিয়েছে? কীভাবে ঠকিয়েছে? জীবনলাল কাল এ বাড়িতে কী বলতে এসেছিল? কোনও মহিলার পক্ষে এ খুন করা সম্ভব? আর... '

'আর?'

'যে ঘরের দরজা-জানালা সচরাচর খোলে না, সে ঘরের জানালা সকালে খোলা কেন?'

'আর কিছু?'

'প্রমথেশবাবু অসহায় মৃত্যুবরণ করলেন কেন? তবে কি উনি জানতেন যে উনি খুন হবেন? তাই যদি হবে তাহলে তিনি পুলিশের সাহায্য নিলেন না কেন?'

'এ তো জটিল ব্যাপার রে ভাই।'

জটিল তো বটে। চ'তো একবার ক্রাইম সিনে যাই।'

'আবার?'

'হুম। কিছু খটকার উত্তর জানাটা দরকার।'

'আমরা ফের দোতলার বৈঠকখানা ছেড়ে উপরে তিনতলার পূর্বদিকের ঘরে, যেখানে প্রমথেশবাবু খুন হয়েছিলেন, সেখানে পৌছালাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম এক ষণ্ডামার্কা পুলিশ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় এগিয়ে গিয়ে কনস্টেবলকে বলল, 'লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ আগেই নিয়ে গেছে।'

'আপনি দদরজটা খুলুন, আমরা ঘরটা একটু পরীক্ষা করব।'

কনস্টেবল আগে থেকেই ধূর্জটিবাবুর কাছে আমাদের কথা জানত তাই বিনা বাক্য ব্যয়ে ও সময়ে দরজাটা খুলে দিল।

আমরা ঢুকে ঘরের এদিক-ওদিক পরীক্ষা করতে লাগলাম। পুলিশি ক্রাইমসিন আমরা চলচ্চিত্রে যা দেখি, একদম সেরকমই বন্ধকী এই ঘর। দরজার বাইরে 'Crime Scene, Do not Cross' টেপ থেকে চেয়ার আর মেঝেতে চকঘড়ির আঁকিবুকি সব আমাদের খুব চেনা। ঘরের বামদিকে একটা চমৎকার বার্মাটিক কাঠের খাট, উত্তরাংশে দু-দুটো বুকশেল্ফ, বুঝলাম পড়ার অভ্যাস ছিল ভদ্রলোকের। বুকশেল্ফ ভর্তি বই। আমি সেই বুকশেল্ফের থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হঠাৎ নীরার জন্য' খুলতে যাব ওমনি বিজয় বলে উঠল, 'স্ট্রেঞ্জ! 'আমি চকিতে ওর কাছে যেতে দেখি আলমারির পাশে পড়ে থাকা একটা মরা মাকড়শাকে খুব কাছ থেকে দেখছে বিজয়। আমি তখন ওকে বললাম, 'এতে স্ট্রেঞ্জের কী দেখলেন?'

'অনেক কিছু আছে। 'বলে বিজয় ঘর থেকেই কনস্টেবলকে হাঁক দিয়ে মেজ বাবুকে ডেকে আনতে বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজবাবু অতীন সিংহ হাজির হন। ছ'ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা, ফর্সা, বেশ ভক্তি হয় পুলিশ বলে।

'একবার রতনকে ডাকুন তো।'

'অতীনবাবু তৎক্ষণাৎ কনস্টেবলকে হুকুম দিলেন রতনকে ডেকে আনতে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রতন ঘরে এসে উপস্থিত। ওকে দেখে মনে হল কেমন একটা ভীত। বিজয় রতনকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল 'তুমি প্রথম লাশটা দেখ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

'তোমার বাবুর রাতে মশার ধূপ জ্বালিয়ে শোবার অভ্যাস ছিল?'

'না। বাবু ওগুলোর গন্ধ একদম সহ্য করতে পারতেন না।'

'আচ্ছা, সম্প্রতি এ ঘরে উই ধরার ওষুধ, ছারপোকা মারার ওষুধ, রঙ - এসবকিছু দেওয়া হয়েছে?'

'না বাবু। বাবুর তো রংয়ের গন্ধে পর্যন্ত অ্যালার্জি ছিল। রংও করতে দিতেন না ঘরে। '

'তোমার বাবু রাতে ঘরে ছিটকিনি দিয়ে শুতেন?'

'না, বাবু সব সময় দরজা খুলে শুতেন। বাবুর বহু দিনের অভ্যাস।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'আজ্ঞে তিরিশটা বছর ধরে বাবুর সেবা করছি, হলফ করে বলতে পারি।'

'আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলে কেন?'

'রতন যেন বিজয়ের থেকে এ প্রশ্নটা আশাই করেনি,'এমন একটা মুখ করে উত্তর দিল 'ইয়ে মানে। ইয়ে.... '

অতীনবাবু তার বিশালাকার চেহারা নিয়ে রতনের কাছে গিয়ে রতনকে ধমক দিতে রতন ভেঙে পড়ল 'মেজদাবাবু বলেছিল।'

'আর কী বলেছিল?'

'বাড়ির সবার ওপর নজর রাখতে। টাকা দেবে বলেছিল।'

'কাল জীবনলাল এসেছিল?'

'হ্যাঁ এসেছিল। আধঘন্টা থেকে চলে গেল।'

'ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল? তুমি শুনেছিলে?'

'না, স্যার। আমি তো তখন রান্নাঘরে ছিলাম।'

'সত্যি তুমি রান্না ঘরে ছিলে?'

'মায়ের দিব্যি স্যার। সত্যি বলছি।'

'বেশ করলাম বিশ্বাস। এখন থেকে তুমি আড়ি তো পাতবে। কিন্তু কথা সব শুধু তোমার মেজবাবুকে নয়, আমাকেও বলবে আর মেজবাবুর উপরও নজর রাখবে। কি মনে থাকবে?'

'আজ্ঞে। 'রতন নিরুপায় হয়ে বিজয়ের কথায় সায় দিল।

'তুমি এখন এসো।'

রতনকে বিদায় দিয়ে বিজয় আবার সেই মরা মাকড়সাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কী সব বলতে লাগল - কি কচুরিপানা, আয় দেখে যা না, পক্ককেশ প্রমথেশ, মাকড়সার রস ইত্যাদি। আমি কিছু বলতে যাব। হঠাৎ অতীনবাবু বিজয়কে প্রশ্ন করলেন 'কিছু বললেন?'

'হ্যাঁ, এই মরা মাকড়শাকে ফরেনসিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আর খোঁজ নিন জাকারিয়া স্ট্রিটে জীবনলাল নামক কোনও হিরে ব্যবসায়ী আছেন কিনা।'

বাকি জেরাটা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমরা আবার দোতলার বসার ঘরে এলাম, নিচে নেমে বৈঠকখানায় না ঢুকে বিজয় দোতলার ঘর ও অন্যান্য সবকিছু দেখতে লাগল। এই তলায় মোট

চারটি ঘর, অজিতেশ বাবু ও স্ত্রীর জন্য একটা কামরা বরাদ্দ, শতরূপ বাবু ও তার স্ত্রীর জন্য একটা আর বাকি দুটো যথাক্রমে নন্দনা আর অমরেশের জন্য। শ্রীপর্ণা দেবী ও তার স্বামী থাকেন এক তলার একটি ঘরে। তবে ইদানিং সে ঘরে মিস্ত্রি কাজ করছে বলে তারা অস্থায়ীভাবে তিনতলার গেস্ট রুমে আছেন। দোতলার বারান্দার ঠিক ফুট দুয়েক পর শুরু হচ্ছে পাঁচিল। সেই পাঁচিলের আগে একটা প্রকাণ্ড লেবু গাছ আর তার ডালপালা বাইরের রাস্তাটা অবধি প্রসারিত। ইচ্ছা করলে বাইরের যে কেউ রাস্তা থেকে এই লেবু গাছের সাহায্যে এই দোতলায় প্রবেশ করতে পারে, এরপর তিনতলায় ওঠা কী আর শক্ত কাজ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস বিজয়ও আমার মত এই কথাগুলোই ভাবছি। কিন্তু আমার মনে এখনও খুঁতখুঁত করছে ওই মরা মাকড়সার ব্যাপারটা। হঠাৎ বিজয় অতীনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘চলুন বৈঠকখানায় যাওয়া যাক। বেলা তো অনেক হল। বাকি জেরাটা সেরে ফেলা যাক। ’

অতীনবাবু আমাদের সাথেই বৈঠকখানায় এলেন। আমরা তিনজন তিনটি চেয়ার দখল করে বসলাম আরেক কনস্টেবলকে ডেকে বাকি সদস্যদের পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বললেন।

একটু ফিসফিসানির স্বরেই অতীনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাইরে যে মহিলাকে কাপড় মেলতে দেখলাম, উনি কে?’

‘উনি শতরূপবাবুর স্ত্রী অঙ্কিতা দত্ত।’

‘ মার্ডার ওয়েপনটা পাওয়া গেল?’

‘না মশাই, খোঁজ চলছে। পুলিশ কুকুর আনতে বলেছি। দেখি কী করা যায়।’

একথা সেকথা করতে করতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন সেই সদ্য স্নান করে ওঠা ভেজা চুলের যে মহিলাকে আমরা কিছুক্ষণ আগে কাপড় মেলতে দেখলাম – শতরূপবাবুর স্ত্রী, অঙ্কিতা দেবী। অসাধারণ সুন্দরী বিশেষণটাও বোধহয় কম হয়। কোনও বাড়তি সাজগোজ ছাড়া ছাপোষা বাঙালি কাপড় আর লাল টিপে অপরূপা মোহময়ী লাগছে তাকে। আমি প্রথম কয়েক মিনিট তো তার দিক থেকে চোখ সরাতে পারলাম না। মনে হচ্ছিল তার ওই রূপের বিষকে আকণ্ঠ পান করি। বিজয় নিজের কাজ শুরু করল –

‘নমস্কার অঙ্কিতাদেবী আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব’

‘নমস্কার, হ্যাঁ করুন।’

‘আপনি কাল রাতে কখন ঘুমোতে গেছিলেন?’।

‘ওই একটা নাগাদ।’

‘কিছু অস্বাভাবিক দেখে বা শুনেছিলেন?’

‘না তেমন কিছু তো নয়।’

‘আপনি ঘটনাটা কখন জানতে পারলেন?’

‘বড়দি সকালের খবর দিতে ওপরে গিয়ে ওই কাণ্ড।’

'আপনার সাথে আপনার শ্বশুরের সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'ওই স্বাভাবিক। উনি আমার সাথে শেষ কয়েক মাস ঠিক করে কথা বলেননি।'

'কেন? '

'তা কী করে বলব বলুন?'

'আপনি পড়াশোনা কতদূর করেছেন? '

'বাবা বেশিদূর পড়াতে পারেননি। ওই ক্লাস টুয়েলভ অবধি।'

'আপনার স্বামীর সাথে শ্বশুরের একটা ঝামেলা চলছিল জানেন তো?'

'হ্যাঁ, তা জানব না। ওতো বাবাকে দিয়ে চারু মার্কেটের দোকানটা নিজের নামে লিখিয়ে নিতে চেয়েছিল। '

'তারপর?'

'বাবা তো লিখে দেননি। ও তাও বাবাকে জোর করত। কাল তো জীবনলালকেও নিয়ে এসেছিল।'

'এই জীবনলালের সাথে আপনার স্বামীর বন্ধুত্বটা হয় কী করে?'

'তা জানি না। তবে ওরা বেশ ঘনিষ্ঠ। একসাথে কী ব্যবসা শুরু করবে বলেছিল।'

'বেশ। আপনার মেয়ে কোথায়?'

'ওর টেস্ট পরীক্ষা চলছে, তাই স্কুলে গেছে।'

'বাড়িতে এরকম অবস্থা, তাও গেল?'

'দেখুন এখন থানা পুলিশ এসব হতে অনেক সময় লাগবে। আর তাছাড়া মেয়েটার সামনে বোর্ড পরীক্ষা। তাই একপ্রকার জোর করেই। ওর তো যাবার ইচ্ছা একদম ইচ্ছে ছিল না।'

'বেশ। ফিরবে কখন?'

'সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'

'বেশ। ওর সাথে তাহলে পরেই কথা বলব।'

'আমি কি তাহলে এখন?'

'হ্যাঁ আপনি এখন আসতে পারেন।'

অঙ্কিতাদেবী কে বিদায় দিয়ে বিজয় একটা ফ্লেক ধরিয়ে বৈঠকখানার এক পাশে রাখা একটা কাঁচের বলকে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

এক ভদ্রলোক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বিজয় অবশ্য দরজার দিকে পিছন ফিরে ছিল। তবে হঠাৎই শোপিস হাতে বলে উঠল 'আসুন পার্থবাবু।'

পার্থবাবু সহ আমরা তো সবাই অবাক। ছেলেটা করে কী? ম্যাজিক জানে না কী? পিছনে ঘুরে একদম নির্ভুলভাবে বলে দিল কে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। এবার দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে ভেতরে আসতে বলল।

'আসুন, নমস্কার। আমি বিজয়।'

'নমস্কার। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে আমি এসেছি?'

'বাড়িতে চারজন পুরুষ। তিনজনের সাথে আগেই কথা হয়ে গেছে। বাকি ছিলেন আপনি। আর আপনার পার্ক অ্যাভিনিউ সেন্ট। আর আপনি সেন্ট জিনিসটা বড্ড বেশিই পছন্দ করেন। তাই তো?'

পার্থবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জিভ কাটলেন। তারপর বললেন, 'মোক্ষম ধরেছেন মশাই।'

'ও সেন্ট শুধুমাত্র পুরুষরাই ব্যবহার করে আর যাদের সংখ্যা খুব কম।'

গন্ধটা অবশ্য আমিও পেয়েছিলাম বটে। একটা উগ্র গন্ধ। ভদ্রলোক সেন্ট জিনিসটা বড্ড বেশি পছন্দ করেন বলতে হবে। কোনো লোক যে এত সেন্ট মাখতে পারে আমি অন্তত এই প্রথম দেখলাম।

'আপনার তো ইলেকট্রনিক্স গুডস-এর দোকান তাই না?'

'হ্যাঁ চাঁদনিতে। বাবা মানে আমার শ্বশুর সেটা করে দিয়েছিলেন।'

'আপনি সার্ভিসিং - এর কাজ জানেন?'

'হ্যাঁ তা একটু আধটু জানি বৈকী।'

'কাল রাত্রে আপনি কখন ঘুমিয়ে ছিলেন?'

'ঠিক মনে নেই। দোকান থেকে বাড়ি ফিরতে আমার বারোটা বাজে। তারপর স্নান খাওয়া সেরে ঘুমোতে যাই।'

'আপনি এই খুনের ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন?'

'আমি আর কি বলব বলুন। আমি এক প্রকার এ বাড়ির আশ্রিত।'

'আপনার শ্বশুড়ের সাথে আপনার সম্পর্ক কী রকম ছিল?'

'নর্ম্যাল।'

'আচ্ছা কাল আপনি অস্বাভাবিক কিছু দেখে বা শুনেছিলেন?'

'না, সেরকম তো কিছু নাহ। তবে কেন জানি না মনে হল রাতে আমার ঘরের পাশ দিয়ে অমরেশকে বেরোতে দেখলাম।'

'মনে হল কেন?'

'আমার ঘরের বাইরের আলোটা খারাপ হয়ে গেছে। তাই সঠিকভাবে বলতে পারব না।'

'আপনি ঠিকই দেখেছিলেন। ওটা অমরেশই ছিল। ও কাল রাতে বাড়ি এসেছিল।'

'তাহলে কী অমরেশ-ই?'

'সেটা তদন্তসাপেক্ষ।'

'আচ্ছা, আপনার শ্বশুরের কোনও উইল আছে?'

'এ ব্যাপারে আমি অন্ধকারে বিজয়বাবু। এসব আমায় জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হবে না।'

'বেশ। আপনার দোকান কেমন চলে?'

'ভালোই। ঠিকঠাক চলে যায়।'

'আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা?'

'বি.এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আশুতোষ কলেজ।'

'আপনার আর শ্রীপর্ণাদেবীর এক কলেজ ছিল?'

'হ্যাঁ, কলেজ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। তারপর চার বছরের প্রেম শেষে বিয়ে'

'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'বরাহনগর'

'আপনি বাড়ি যান না?'

'কেউ থাকলে তবে তো যাব।'

'কেন?'

'দেখুন অনেক ছোটবেলায় আমি আমার মা-কে হারাই। তারপর বাবা চলে যেতে আর ও বাড়িতে থাকতে মন করে নি।'

'ও বাড়িতে আর কেউ থাকে না?'

'কাকা আছেন।'

'আপনার সম্পর্কে তো আপনার শ্যালকের খুব একটা ভালো রায় নেই কিন্তু'

'কি বললেন? আমি জুয়াড়ি - মাতাল এই তো? এ আর নতুন কী?'

'যাক গে, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা, সাথে দোকানেরও'

'হ্যাঁ। ৫৩ /১ গোপাল লাল ঠাকুর রোড - বাড়ির ঠিকানা।'

৬৮এ জি.সি. অ্যাভিনিউ আমার দোকানের ঠিকানা।'

'ধন্যবাদ পার্থবাবু।'

'নো মেনশন। আমি কি এখন যেতে পারি?'

'হ্যাঁ আপনি আসতে পারেন। 'বললেন অতীনবাবু।

পার্থবাবু আমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিজয় একটা ফ্লেক ধরিয়ে অতীন বাবুকে একটা অফার করে বলল, 'অতীনবাবু অমরেশকে ধরার ব্যবস্থা করুন। আর নন্দনাকে থানায় ডেকে পাঠান পরীক্ষা দিয়ে এলে।'

'হ্যাঁ লোক লাগিয়েছি। অমরেশ খুব শিগগির ধরা পড়বে।'

'পোস্টমর্টেম আর ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট এলে খবর দেবেন।'

'নিশ্চয়ই। আর কিছু?'

'জীবনলালের খোঁজ পাওয়া গেল?'

'হ্যাঁ গেছে। জীবনলাল মেবানি। গুজরাত হীরের ব্যবসায়ী। শহরের রত্নমহলে রত্ন খচিত নাম। ইদানিং নিজের একটা শোরুম খুলবে বলে দোকান ঘর খুঁজছে কলকাতায়। জাকারিয়া স্ট্রিটে 'শংকরালয়'-এর চার তলায় ওর অফিস।'

'বাহ চমৎকার। শোরুমের জন্য দোকান ঘর খুঁজছে। ইন্টারেস্টিং। কখন গেলে দেখা পাওয়া যাবে?'

'সন্ধ্যাবেলা সাতটা অবধি উনি ওই অফিসে বসেন।'

'আজ বসবেন?'

'হ্যাঁ। বসবেন।'

'আচ্ছা আজই যাব তাহলে।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে বিজয়বাবু?'

'খুনটা হল, কিন্তু লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা তো অনেকেরই। তবে একটা জিনিস দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে খুনটা চুরি বা লুঠপাটের জন্য করা হয়নি। ঘর থেকে কিছুই মিসিং নেই।'

'হ্যাঁ। রতন আর অজিতেশবাবুও তো একই কথা বললেন।'

'অপদার্থ মেজ ছেলে, কুলাঙ্গার নাতি, অকর্মণ্য শৌখিন জামাই আর হীরের রাজার আগমন। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। বিজয় এসব বলতে বলতেই হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও বাবা! তিনটে বাজে। নাওয়া-খাওয়া কিছুই হয়নি। এরপর আর দেরি করলে কপালে অশেষ দুর্ভোগ আছে। অতীনবাবু আমাদের একটু পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'আপনি আসুন। নিচে জিপ দাঁড়িয়ে আছে।'

আমরা এরপর দত্ত বাড়ির গেটের সামনে যখন এসে পড়েছি, হঠাৎ রতন কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ' একটা কথা ছিল বাবু।'

'কী কথা?'

'ওই জেবনবাবু কিন্তু বাবুকে জানে মারার হুমকি অবধি দিয়েছিল বেশ কয়েকবার।'

'কাল এরকম কিছু বলেছিল?'

'কাল তো আমি ওপরে ছিলাম না বাবু, তাই কিছু জানি না।'

'আচ্ছা। বেশ। তুমি এখন আসতে পার।'

এরপর আমরা পুলিশের জিপে চড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। অতীনবাবু অবশ্য আমাদের সাথে একই জিপে এলেন না। উনি বললেন ওনাকে থানায় ফিরে রিপোর্ট করতে হবে। ধূর্জটিবাবু আমাদের পরে ফোন করে নেবেন। এই বলে উনি অন্য একটি জিপে রওনা দিলেন। আমাদের জিপটা সবেমাত্র রাসবিহারী ক্রসিং পেরিয়েছে। আমি তখন বিজয়কে বললাম, 'আচ্ছা জীবনলাল লোক লাগিয়ে খুনটা করতে পারে না? বিজয় বলল, 'জানি না। অতো বকাসনি। খুব খিদে পেয়েছে। বাড়ি ফিরে খাবারের সাথে সাথে মায়ের বকুনিও খেতে হবে। সে খেয়াল আছে?'

'ন্যাকা, বলে বকাস না। আর কিছু জিজ্ঞেস করব না যা।'

'বিকেলটা ফাঁকা রাখিস।'

'কেন?'

'জীবনলাল মেবানি আর তারপর একটু অ্যানালিসিস।'

'তুই আজই যাবি জীবনলালের কাছে?'

'তো তুই তখন কী শুনলি?'

আমি এরপর আর কিছু বললাম না। সারাটা রাস্তা আমাদের আর কোনো কথা হল না। পাড়ার মুখে ঢোকার আগে বিজয় আরেকবার খালি বিকেলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ির পথে অগ্রসর হল। আবার বিকেলে ওর সাথে বেরোতে হবে বাড়ি ফিরে স্নান করে মুড়িঘণ্ট দিয়ে ভাতটা খেয়ে সবেমাত্র একটা ছোট সান্ধ্য নিদ্রা দেব ভাবছি, ঠিক তখনই এল ভোলা। ভোলা আমাদের পাড়াতেই থাকে। খুব সাহসী আর ডানপিটে। আমার আর বিজয়ের খুব ন্যাওটা। ও আজ এসেছে আমায় নিয়ে ছাদে যাবে ঘুঁড়ি ওড়াতে। ও মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ি আসে। আমাদের বাড়ির ছাদটা এ তল্লাটে সবথেকে বড়, তাই ঘুঁড়ি ওড়ানোর পক্ষে আদর্শ। ও যে আমি না যাওয়া অবধি ছাড়বে না, সেটা বিলক্ষণ জানি। তাই অগত্যা ওর সাথে ওপরে যেতেই হল। এক ঘন্টা ওর সাথে ঘুঁড়ি উড়িয়ে বেশ মজাই হল। নিচে নেমে ভোলাকে দুটো বিস্কুট দিয়ে বিদায় করতে যাব, দরজার সামনে দেখি বিজয় দাঁড়িয়ে।

'যাবি কি না?'

'আরে যাব তো। এইতো সবে পাঁচটা দশ।'

‘সময় নেই। তাড়াতাড়ি চল।’

‘পাঁচ মিনিট দে, যাচ্ছি।’

আমরা যখন জাকারিয়া স্ট্রিটের মোড়ে ট্যাক্সিটাকে ছাড়লাম তখন ঘড়িতে ছটা বাজে। জাকারিয়া স্ট্রিটের মোড়ের বাঁদিকে কিছুদূর এগোলেই আসবে ‘শংকরালয়। ’ যদিও পুজো আসতে ঢের দেরি তাও বড়বাজার আর কবে শান্ত আর ফাঁকা থাকল! দিনের প্রতিটা সময়ই গমগম করে শহরের ব্যস্ততম এই এলাকাটা। গুজরাটি হালুয়া আর বিহারী পানের দোকান ছাড়িয়েই চোখে পড়ল বাড়িটা। পাঁচতলা প্রকাণ্ড এক বাড়ি, ঢোকার মুখে সিঁড়ির পাশে সমস্ত অফিসের নেমপ্লেট লাগানো, বিজয় জীবনলালের অফিসের নেমপ্লেটটা দেখে সামনের এন্ট্রি খাতায় আমার আর ওর নামের এন্ট্রি করে সোজা লিফটে উঠে পড়ল। তিনতলার ডানদিকে চতুর্থ ও পঞ্চম ঘরটা নিয়ে জীবনলালের অফিস - বাইরে বড় বড় করে ইংরেজিতে লেখা ‘MEBANI ASSOCIATES. ’আমরা চার নম্বর ঘরে ঢুকে নিজেদের পরিচয় দিতে রিসেপশনিস্ট বসতে বলে ভেতরে কাউকে ফোন করলেন, পাঁচ মিনিট পর আমাদের ডাক পড়ল। পাশের পাঁচ নম্বর ঘরের মাঝের কেবিনে ঢুকে আমরা যাকে দেখলাম - তিনিই জীবনলাল মেবানি। কাঁচা-পাকা চুল, চোখে সোনালি রঙের রিমলেস চশমা।, হাতে দামি ঘড়ি, সাদা জিনিসটা বোধহয় পছন্দ করেন বেশি, পরনে সাদা ফুল শার্ট ও ট্রাউজার, ওর চেয়ারের পাশে একটা বড় গণেশের মূর্তি। আমাদের বসতে বলে অর্ধেক হিন্দি আর অর্ধেক বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন,

‘ আপলোগের মধ্যে ইয়ে বিজয় সাব কৌন আছেন?’

বিজয় নিজের পরিচয় দিল – ‘ওটা আমি।’

‘অউর ইনি?’ আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন বিজয়কে।

‘আমার বন্ধু।’

‘বেশ। তো কী জানতে চান বলেন? ’

‘প্রমথেশবাবু খুন হয়েছেন জানেন তো?’

‘হ্যাঁ, শতরূপের সাথে সকালে কথা হল। তোখোন বলছিল। ভেরি স্যাড।’

‘আপনিও তো ও বাড়িতে বেশ কয়েকবার গেছেন। তাই না?’

‘হ্যাঁ, সে গেছি। শতরূপ নিয়ে গেছিল।’

‘কেন সেটা জানতে পারি?’

‘হ্যাঁ সার্টেনলি। ওদের ওহ চারু মার্কেটের দুকানটা কিনে লিতে চাই। আমার ওহ খুব পছন্দ।’

‘উনি কী বললেন?’

‘রিফিউজ করলেন। বললেন ওহ দোকান এর লক্ষ্মী। ওটা উনি সেল করবেন না।’

‘আপনি তো শাসিয়েছিলেন ওনাকে যে দোকান না পেলে আপনি ওনাকে মার্ডার করবেন।’

আশ্চর্য জীবনলাল কিন্তু একটুও ঘাবড়ালো না। বরং হালকা ছলে বলল – 'সোব খোবর তো লিয়েই এসেছেন দেখছি। দেখেন বিজয় বাবু হামি বিজনেসম্যান, যেখানে ফায়দা দেখবে সেখানে তো যাবেই। ওহ দুকান আমি পেয়ে গেলে ফার্স্ট সাউথ কলকাতা অউর ফির কলকাতার স্টোনকিং হয়ে যেতাম, আমার মত ভাল আর সস্তা স্টোন অন্য কেউ দিতে পারবে? ওহ দুকান তো যে জায়গায় সে দুকান পুরো সাউথ কলকাতার স্টোন মার্কেট কন্ট্রোল করত, আর ওহ দুকান তো চলছিল না, কিছুদিন বাদে এমনিই উঠে যাবে।'

'হ্যাঁ, খুনের দিন রাতেও তো আপনি ওখানে গেছিলেন।'

'হ্যাঁ গেছিলাম লাস্ট অফার নিয়ে। উনি তো না শুনলেন না, সমাঝলেন না, উল্টে শতরূপ কে গালি দিতে লাগলেন।'

'ঠিকই বলেছিলেন মনে আছে?'

'ওতো বাঙালি তো হামি বুঝে না। তবে হাঁ কুছু উঁচু মহাভারতকা বোল রহে থে'

'কী বলছিল?'

'কেয়া কুছু ভুল কিয়া হ্যায়, জয়দ্রথ, দ্রোণাচার্য এসব'

'আপনার তো নর্থে চারটে শোরুম।'

'না, চারটে নয় পাঁচটা। ওহ লাস্ট উইক সোল্ট লেকেরটা ওপনিং হল।'

'শতরূপের সাথে আপনার কোথায় আলাপ?'

'ওই রিজেন্ট ক্লাবে। আমরা এক ক্লাবের মেম্বার।'

'কী ধরনের ক্লাব?'

'ব্রিজ, পোকার, রামি সোব খেলা হয়, খাওয়া – দাওয়া এসব।'

'শতরূপ বাবার অমত থাকবে জানা সত্ত্বেও আপনাকে দোকানটা কমিট করে দিল?'

'না করে তো কোনো উপায় ছিল না। ওর বেওসায় কেত্ত টাকা লস আপনি জানেন? জুয়া অউর রেসের মাঠে কেত্তো টাকা ধার আপনি জানেন? আমার কাছে ওর ষাট লাখ টাকা ধার আছে। তাই আমি ওকে একদিন বললাম যে তুম তো উধার ওয়াপস করতে পারবে না, তার থেকে ভালো তুমাদের দোকানটা আমাকে লিখে দাও। উল্টে হামি তোমাকে এক কড়োর দিবে।'

'রাজি হয়ে গেল?'

'উপায় ছিল না।'

'কিন্তু এখন তো ও দোকান আপনি আর পাবেন না।'

'জীবনলাল যা চায় সেটা পায়। আমার কাছে অনেক রকম ওষুধ আছে বিজয় বাবু। মিঠা জেলুসিলে কাম না হলে, কড়ওয়া কুইনাইন আছে।'

'কুইনাইন তো আপনি অলরেডি প্রয়োগ করে ফেলেছেন, তাই না?'

'দেখেন বিজয়বাবু, মিঃ দত্তাকে যদি আমার মারার হতো আমি সেটা কোবেই করে দিতাম। এতদিন ওয়েট করতাম না। তাছাড়া অযথা খুন হামার বিলকুল না পসন্দ।'

'কিন্তু এখন তো আপনার টাকাটাও গেল আর দোকানটা ও পাওয়া হল না।'

'হামি এখনও খেলিনি বিজয়বাবু। অউর এক বাত ওহ দোকানটা হামি-ই পাবে দিখে নিবেন।'

'দত্ত বাড়িতে চুরিটাও তো আপনারই কাজ?'

' জীবনলাল চেয়ারে গা এলিয়ে মুখে হাসি নিয়ে, বলা যায় বিজয়ের প্রতি একপ্রকার ব্যঙ্গ করেই বলল, 'আপনি কুচ প্রমাণ করতে পারবেন না।'

' দেখা যাক।'

'আপকো দেখকে হামার খুব শার্প অউর ইন্টেলিজেন্ট মালুম হচ্ছে। আপনি হামার একটো কাম করতে পারেন?'

'কি কাজ?'

'ওহ দলিল উদ্ধার করলে, আপনি ওটা পুলিশকে দিবেন না, হামাকে দিবেন।'

'মানে চুরি করতে বলছেন তো?'

' রাম – রাম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। নাহি নাহি। চোরি কাঁহা করতে বললাম।'

'তো অন্যের দলিল আপনার কাছে পৌঁছানোর মানে কী?'

'বিজনেস। আই উইল পে ইউ ফর দ্যাট ওয়ান ল্যাকস ক্যাশ।'

'মিঃ মেবানি, আমি সত্য অনুসন্ধান করি। বেচি না। গুডনাইট। '

আমরা আমাদের চেয়ার ছেড়ে উঠে কেবিনের গেট খুলতে যাব এমন সময় পেছন থেকে জীবনলাল বলে উঠলেন, বিজয়বাবু আমার কাছে কিন্তু দু'রকমের আদমি আছে। ভালো কাম করার জন্য আর খারাপ কাম করার জন্য।

' মনে থাকবে,' বিজয় বলল।

আমরা যখন বউবাজারগামী ট্রামটা ধরব তখন ঘড়িতে ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। বিজয় খুব গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে কোনও এক গভীর ভাবনায় ভাবনারত। আমিই প্রথম নিস্তব্ধতাটা ভাঙলাম 'লোকটা কী রকম শাসাল দেখলি?'

'একটা আস্ত জানোয়ার। ওর ওসব হুমকিতে বিজয় সেনশর্মা ডরায় না।'

'উফফ! সে আর বলতে! পাক্কা ধরিবাজ লোক।'

'একটা জিনিস কি জানিস?'

‘কী?’

‘মনে হচ্ছে জীবনলাল এই খুনটা করায়নি।’

‘কেন?’

‘গাট ফিলিংগস বলছ। মোটিভটা ঠিক বসছে না।’

‘কেন উইলটা?’

‘সেটা ঠিকই। কিন্তু তার জন্য খুন করার কী দরকার? মাথায় বাড়ি মেরে বা অজ্ঞান করেও করেও তো কাজটা করা যায়। নাহ আরও ভাবতে হবে রে। কাল সন্ধ্যাবেলা একবার রিজেন্ট ক্লাবে যাব ভাবছি।’

আমরা যখন মুড়ির বাটি আর চায়ের কাপ হাতে আমার ঘরে এসে বসেছি, ঘড়ি জানান দিচ্ছে যে আটটা বাজে। বিজয় জাকারিয়া স্ট্রিট থেকে ফিরে বাড়ি না গিয়ে সোজা আমার বাড়ি চলে এসেছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে টপাটপ মুড়ি সাবার করে চায়ের প্রথম চুমুকটা দিয়ে বলতে শুরু করল ‘আজ তোর পরীক্ষা।’

‘পরীক্ষা মানে?’ মুড়ির বাটিটা পাশের টেবিলে রেখে বললাম আমি। ‘

‘মানে দত্ত বাড়ির লোকেদের সম্পর্কে তোর একটা ধারণা।’

‘না ভাই। বাদ দে । হবে না।’

‘সব হবে। সারাটা সকাল তো আমার সাথে ছিলিস, এটুকু হবে না?’

দেখলাম যে বিজয়ের থেকে পার পাওয়া অসাধ্য।তাই একপ্রকার রাজি হতেই হল বললাম, ‘বল কী পরীক্ষা করবি?’

‘তার আগে আমায় বল প্রমথেশ দত্ত কীভাবে খুন হল?’

‘ওই ভোকাল পাইপ কেটে।’

‘গাধা! ওটা ভোকাল কর্ড আর উইন্ড পাইপ।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই।’

‘এমন দুটো জায়গা কেটেছে যাতে প্রতিরোধ করার কোনো সম্ভাবনাই যেন না থাকে।’

‘ঠিক।’

‘কী ঠিক?

এরপর বলল, ‘প্রমথেশবাবুর ইনসোমনিয়া ছিল, তিনি বেশি রাত অবধি জেগে থাকতেন। তাই যদি হয় তাহলে তিনি ওই দিন ওই সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কেন? কারণ একটা লোক ঘুমন্ত অবস্থায় থাকলে, তার থেকে প্রতিরোধের পরিমাণ ন্যূনতম? ’

'কিন্তু উনি তো ঘুমিয়ে পরতেই পারেন।'

'তা পারেন। কিন্তু সেটা হলে গলা কাটার পর তো ধস্তাধস্তির চিহ্ন থাকবে। কিন্তু ঘরের কোথাও কোন ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন নেই।'

'তার মানে?'

'তার মানে একটা আছে বটে। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে না আসা অবধি সিওর হতে পারছি না।'

'প্রমথেশবাবুকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। জ্ঞান হীন অবস্থায় কেউ কোনো প্রতিরোধই করতে পারবে না।'

'কিন্তু কী করে?'

'হয়তো কোনো সিডেটিভ (চেতনানাশক) খাইয়ে।'

'তার মানে তো বাড়ির লোক-ই… '

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আর যেভাবে খুনটা করা হয়েছে।'

'ডাক্তারি বিদ্যার যোগ বলতে চাস?'

'হয়তো।'

'তাহলে তো অমরেশ।'

'হ্যাঁ ওর উদ্দেশ্য আর সুযোগ দুটোই খুব পোক্ত। এছাড়া ও একজন ডাক্তারী ছাত্র মানুষের শরীর ওর কাছে জলভাত।'

'তাহলে তো মিটেই গেল।'

'তাই কী? এত তাড়াতাড়ি উপসংহার টানবি?'

'যা বাবা। তাহলে তুই বল।'

'অজিতেশ দত্ত ।'

'কী অজিতেশ দত্ত?'

'অজিতেশ দত্ত সম্পর্কে যা জানো সংক্ষেপে বর্ণনা করো। 5 মার্কস।'

' ইয়ার্কি মারিস না। ধুর।'

'আচ্ছা বল।'

'বাড়ির বড় ছেলে। দত্ত জুয়েলার্সের দুটো দোকানের ইনচার্জ। সকালে যতটা দেখলাম মনে হল নির্ভীক আর ভদ্র মানুষ। একটু গোবেচারা টাইপ।'

'সেটা তো অভিনয়ও হতে পারে।'

'কিন্তু মোটিভ কী বল?'

'যদি চারটে দোকানের সর্বেসর্বা হওয়া যায় কিন্তু সে করলে তো শতরূপ দত্তকে সরাতে হবে। আর খুন হয়েছে প্রমথেশ দত্ত। আর একটা নার্ভের রোগীর পক্ষে, যার সর্বদা হাত কাঁপে, সে ওরকম একটা নিখুঁত খুন করা।। কাজেই আউট।'

'এরপর শতরূপ দত্ত। '

'দত্ত বাড়ির ছোট ছেলে। বাকি দুটো দোকানের ইনচার্জ, সৌখিন ও বেহিসাবি প্রকৃতির লোক, বাজারে অনেক টাকা দেনা, জীবনলালের সাথে বন্ধুত্ব আর বাপের মৃত্যুতে শোকাহত নয় বলে মনে হয় কেন কাছা নেওয়ার জায়গায় দামি টি-শার্ট আর জিন্স, হয়তো এই মুহূর্তে অনেকগুলো টাকার প্রয়োজন, তারপর এই ধরনের বোহেমিয়ান আর বেহিসাবি জীবন লিড করতে গেলে অসীম টাকার যোগান প্রয়োজন। বাবা মরলে উইল অনুযায়ী অংশ পাবে কিন্তু যদি উইল নাও করে গিয়ে থাকে তাতে খুব একটা হেরফের কিছু হবেনা কিন্তু লোকটা রাত্রি একটা দেড়টার সময় যে অবস্থায় থাকে তাতে তার পক্ষে ওরকম ভাবে একটা নিখুঁত খুন করা.... '

'পারে না বলছিস? '

'লোকটা বেহেট মাতাল রে, আমি সকাল এগারোটার সময় ওর মুখ দিয়ে মদের গন্ধ পেয়েছি আর ওর ঘরের বাইরে বোতলের ছড়াছড়ি তবে যদি নিজে না করে অন্য কাউকে দিয়ে করায় তাহলে অবশ্য অন্য কথা, তাই শতরূপ দত্ত ইন।পরের জন রতন। '

'ও বাড়ীর পুরনো ভৃত্য, প্রভুর মৃত্যুতে শোকাহত, লোকের ধরে আড়িপেতে বেড়ায়। '

'সে বলেছে শতরূপ দত্ত বলেন তাকে আড়ি পাতে বলেছে, কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। যদি সেটা হয়ে থাকে তো একটা সম্ভাবনা হলো রতনের আড়িপাতার অভ্যাস আছে আর এটা যদি হয় তো ওর পক্ষে এমন অনেক রহস্য জানা সম্ভব যেগুলো অন্য কেউ জানেনা। যেদিন জীবনলাল এসেছিল আমি নিশ্চিত ও সেদিনও সব আড়িপেতে শুনেছিল , আমাদের কাছে চেপে গেল। '

'তাহলে? '

'মোটিভ এত স্ট্রং নয়। নিজের মালিককে খুন করে লাভটা কি? '

'কোন লাভ নেই বলছিস? '

'আমার তো এখনো কিছু চোখে পরলোনা।যাকগে আপাতত ইন ।পরের জন অঙ্কিতা দত্ত।'

'সুচিত্রা সেন, মাধুরী দীক্ষিত আর শ্রীদেবীর পারফেক্ট কম্বিনেশন। '

'অমনি একটা পরস্ত্রীর দিকে নজর গেছে? তোর বৌদি বাজি টা আর গেল না। '

'আরে তুই বলতে বলি তাই বললাম আর আমি বৌদিবাজি করিনা ঠিক আছে? '

'আচ্ছা আচ্ছা বল। '

'সুন্দরী, সুবক্তা যেকোনো অবস্থায় অবিচলিত। '

'সেটা কেন? '

'এরকম একটা কঠিন সময়েও কিরকম হেসে হেসে কথা বলে গেল আর কিছুতেই এই মহিলা খুন করতে পারেন না। '

'কেন? কেন? '

'এরকম একটা সুন্দরী মহিলা কেন কাউকে ওভাবে খুন করবে ভাই? রূপের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেই তো পারে। '

'তোর ভাবগতিক সুবিধার নয়। কাকিমাকে বলে তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। তাছাড়া তুই এরপর আর দত্ত বাড়িতে যাবি কিনা ভাবতে হবে শেষে বৌদি? '

'খারাপ হচ্ছে কিন্তু বেকার আমায় নিয়ে মশকরা করছিস।'

'হাহাহা। '

'কিছু বলবো না যা, বললেই উল্টোপাল্টা কেস খাওয়া। '

'আচ্ছা আর ডিস্টার্ব করবো না। '

'ওনার কথা শুনে তো মনে হলো প্রমথেশবাবু ওনাকে ঠিক পছন্দ করতেন না। '

'কেন করতেন না? সেটা কি সাম্প্রতিক না দীর্ঘদিন? '

'আশ্চর্য সেটা আমি কি করে জানব?'

'মাথা খাটাতে হবে। দীর্ঘদিনের যদি রাগ হয় তাহলে ভদ্রমহিলা এতদিন চুপচাপ বাড়িতে থাকলেন কেন? অনেক আগেই অন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে পারতেন, নাকি সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন যাতে প্রতিশোধ নেওয়া যায়। '

'কিসের প্রতিশোধ? '

'সাম্প্রতিক গজিয়ে ওঠা বিরাগ আর বঞ্চনার। মেয়েরা খুব সেনসেটিভ হয় ভাই। '

'তাহলে? '

'ইন'

'পরের জন। সীমা দত্ত। কিছু বলার আগে বলি সন্তানের প্রতি অপত্য স্নেহ খুনের কারণ হতে পারে। '

'নিজে?'

'টাফ । নিজে না করে লোক দিয়ে করাতে পারে। '

'মানে সীমা দেবী ইন কি আউট? '

'আউট কেন হতে যাবে? ইন'

'আচ্ছা শ্রীপর্ণা দেবী? '

'আমার মন বলছে, না'

' কেন না কেন? '

পকেট থেকে একটা প্লেট ধরিয়ে বিজয় বলল 'মোটিভের অভাব। যে লোকটা তার বাবা, তাকে খেতে-পরতে দিয়েছে, মানুষ করেছে, বিয়ের পরে বাড়িতে জামাইসহ থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে জামাইকে দোকান করে দিয়েছে। নাহ রূমকী দিদিমনি আউট। '

'শুরু থেকেই দেদেখছ শ্রীপর্ণা দেবীর প্রতি তোর আলাদা একটা দুর্বলতা আছে। '

'ওসব গল্প দিয়ে লাভ নেই গুরু আমি এক্সাইটেড হব না। '

'তাহলে বাকি রইল পার্থবাবু'

' দত্তবাড়ির জামাই, দত্ত বাড়ির মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করে বিয়ের এক বছর পর শ্বশুর বাড়িতে হাজির, শ্বশুরের করে দেওয়া চাঁদনি চকের ইলেকট্রনিক্সের দোকান চালায়, শতরূপবাবুর কথায় মদখোর আর জুয়াড়ি। '

'খুন করতে পারে বলছিস? '

'হ্যাঁ তা পারে কিন্তু মোটিভ পাকা নয়। দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমোচ্ছে, শ্বশুরের টাকায় ফুর্তি করছে না এদের সবার ব্যাকগ্রাউন্ড টা জানা খুব দরকার। '

'আর অমরেশ? '

ও তো প্রাইম সাসপেক্ট, তাই ওকে নিয়ে ওভাবে ভাবছি না।'

'ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবি কি করে? '

'ধূর্জটিবাবুকে একটা ফোন করতে হবে' বলে পকেট থেকে মোবাইল বের করে বিজয় বলল যে দত্ত বাড়ির সমস্ত সদস্যদের সম্পর্কে যত তথ্য জানা যায় সব জোগাড় করে রাখতে, কথা শেষ হলে পর আমরা রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ায় বেশ রাত অব্দি আড্ডা দিয়ে যে যার বাড়ি ফিরলাম

বিকেলে একটা নতুন পোর্ট্রেট নিয়ে বসব বসব ভাবছি, এমন সময় আমার মোবাইলটা বেজে উঠল। তুলে দেখি বিজয়। আমায় বলল যে আমি যেন ইমিডিয়েট লালবাজার চলে আসি কারণ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসে গেছে। অবশ্যই, আমার যদি আমার ইচ্ছা হয় যাওয়ার তো। আমি কাল বিলম্ব না করে জামাটা গায়ে দিয়ে বাড়ি পড়ার চটিটা পড়েই বেরিয়ে গেলাম। আমার লালবাজার পৌঁছতে লাগল মিনিট কুড়ি। আমাদের বাড়ি থেকে লালবাজার হাঁটাপথ। গিয়ে গেটে

আমার পরিচয় দিতে ও ধূর্জটিবাবুর নাম করতে এক কনস্টেবল আমায় অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ের চার তলার পনেরো নম্বর ঘরের কথা বলে দিলেন। আমি লিফটে করে চার তলার উক্ত ঘরে পৌঁছে দেখি একটা টেবিলের এদিকে তিনটি চেয়ার, তার দুটো অধিকার করে বসে যথাক্রমে ধূর্জটিবাবু আর বিজয়। অন্যটি ফাঁকা। বুঝলাম আমার জন্যেই সেটা রাখা। আর টেবিলের ওপারে এক অতিকায় ভুঁড়িসম্পন্ন প্রৌঢ়। বয়স পঞ্চাশ – পঞ্চান্ন হবে।, গায়ে অ্যাপ্রন আর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে জলন্ত সিগারেট। বুঝলাম ইনি পুলিশের ডাক্তার। রিপোর্ট এনারই তৈরি করা। ধূর্জটিবাবু বললেন, 'আসুন মশাই। আপনারই অপেক্ষা করছি এতক্ষণ।'

'আমি ঘরে ঢুকে ডাক্তারের সাথে প্রাথমিক আলাপ সারামাত্র ডাক্তার বলা শুরু করলেন –

'Excessive bleeding cause to death (অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু), আর একদম পেশাদারি কায়দায় খুনটা করেছে। কিন্তু সমস্যা হল রিপোর্ট inconclusive (উউপসংহারবর্জিত) ।আমরা সবাই তখন হতবাক। কারণ রিপোর্ট inconclusive তখনই হয় যখন ডাক্তার মৃত্যুর সঠিক কারণ বলতে পারেন না। কিন্তু এক্ষেত্রে তো মৃত্যুর কারণ জানা যাচ্ছে। কেউ প্রমথেশ দত্তের গলা কাটেন ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু। সেক্ষেত্রে inconclusive কেন?'

ধূর্জটিবাবু বলেন, 'সে কী মশাই এইতো বললেন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।'

ডাক্তার বললেন, 'ওটা একটা। আরেকটা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না।'

ধূর্যটিবাবু বললেন, 'কী সেটা?'

'অনেকক্ষণই প্রমথেশবাবুর মাথায় অক্সিজেন পৌঁছায়নি, খুন হওয়ার আগে আর এভাবে কোনও প্রতিরোধ ছাড়া কেউ কারোর গলা তখনই কাটতে পারে যখন মৃত ব্যক্তি হয় শয্যাশায়ী রোগী অথবা অচৈতন্য।'

'ভিসেরা রিপোর্ট?'

'আলকোহল বা সেডেটিভসের কোনো ট্রেস নেই।'

তখন বিজয় বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে ওনাকে প্রথমে কেউ অজ্ঞান করে, তারপর খুন করে?'

'একদম ঠিক, কিন্তু কোনও ঘুমের ওষুধ বা কিছুর ট্রেস নেই তো।'

'ক্লোরোফর্ম মুখে চেপেও তো কাজটা করতে পারে।'

'পারে, তাহলে প্রথমত ধস্তাধস্তি হবে আর দ্বিতীয়ত, নাকের নীচে দাগ থাকবে, যা এক্ষেত্রে নেই। '

'সিরিঞ্জের চিহ্ন?'

'নেই। আমার এত বছরের সার্ভিসে এরকম খুন এই প্রথম দেখলাম।'

'আচ্ছা, মার্ডার ওয়েপনটার সম্পর্কে কোনও ধারণা দিতে পারেন?'

বকুক বকুক বকুক

'ওয়েল ক্ষতস্থান আর জখমের গভীরতা দেখে এটা বলতেই পারি শার্প কিছু দিয়ে এটা করা হয়েছে। একদম clean আর precise one shot cut, আর হ্যাঁ যে করেছে সে এ কাজে পটু। কোথায় কোন অর্গ্যান আছে খুব ভালো করে জানে।'

'আর আততায়ী সম্পর্কে?'

'হত্যার ধরন দেখে পুরুষ বলে মনে হয়। না হলে ক্ষতস্থান এতটা গভীর হয় না। সামনে থেকে ত্যারচাভাবে ওপেয়নটা চালিয়েছে। '

'আপনি সিওর সামনে থেকে?'

'একদম সিওর। '

'সবই তো বুঝলাম ডাক্তারবাবু, কিন্তু অচৈতন্য হওয়াটা তো সব তদন্ত গুলিয়ে দিল যে।'

'যা রিপোর্ট এসেছে আর যা সম্ভাবনা আমি আপনাকে বলে দিলাম। '

'ডাক্তারের সাথে কথা বলতে বলতে দেখলাম, বিজয়ের মাথার ভ্রূকুটি। আমি নিশ্চিত আমাদের সবার মত বিজয়ও এই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হতবাক ও হতচকিত, আবার নতুন করে সব রহস্য জাল বুনছে, ছাড়ানোটা অত্যন্ত দরকার। '

এরপর আমরা যতীনবাবুর (ডাক্তার) সাথে বাইরে আসি। বিজয় ধূর্জটিবাবুকে দত্তবাড়ির সদস্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো করতে শুরু করল-

'আপনাকে যে ইনফরমেশনগুলো জোগাড় করতে বলেছিলাম, সেগুলো হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি। আমার খোঁচরগুলোকে সব এই কাজেই নামিয়েছি'

'বেশ। এক এক করে বলুন তো দেখি।'

'অজিতেশবাবু দোকান আর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও বিশেষ যান না। কোনও বন্ধু নেই বললেই চলে। সৎ - নির্ভীক মানুষ, হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী। যতদূর জানলাম বাপের সাথে সদ্ভাব ছিল।'

'বলে যান।'

'সীমাদেবী পাকা গৃহিনী, বাইরে বিশেষ বেরোন না।'

'ওনার বাপের বাড়ি কোথায়?'

'বজবজ। গরীব ঘরের মেয়ে, বাবার মুদিখানার দোকান। অভাবের সংসার ছিল। পড়াশুনোও বিশেষ করে উঠতে পারেননি। বিয়ে হয় নাইনটি টু'তে। প্রমথেশবাবু নিজে পছন্দ করে এনেছিলেন।'

'অমরেশ? ওর কোনও ট্রেস পেলেন?'

'এখনও অবধি তো পাই নি। তবে পেয়ে যাব। '

'ওকে রিমান্ডে নেওয়াটা খুব জরুরি ধূর্জটিবাবু। আর ওর ঘরটা একবার সার্চ করে দেখবেন তো।'

'বেশ। তবে ও ছেলে খুব সুবিধার না। মেডিক্যালের ছাত্র, উচ্চমাধ্যমিক অবধি নাকি ঠিক ছিল। তারপর ওই ডাক্তারি কলেজে গিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। মদ-গাঁজা, ড্রাগ, মেয়েছেলে কিছুই বাদ নেই।'

'ওর স্পেশালাইজেশন কি?'

'ই-এন-টি।'

'মানে শল্যবিদ্যার সাথে জড়িত। আর শতরূপবাবু?'

'দোকানে বসে ঠিকই কিন্তু সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বে বলে মনে হয়। প্রায়শই দোকান থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর পাব, বার এসব। ওনার আবার রেসের মাঠের নেশাও আছে। বিভিন্ন জায়গায় কয়েকবার হাতাহাতিতেও নাকি জড়িয়ে পড়েছিলেন। '

'রিজেন্ট ক্লাবের মেম্বার, মাথার উপরে প্রচুর টাকার দেনা আর জীবনলালের সাথে ঘনিষ্ঠতা।'

'আপনি কি ম্যাজিক জানেন না কি? এসব জানলেন কি করে?'

'কাল জীবনলালের অফিসে গিয়েছিলাম, ওই সব বলছিল।'

'সে কী মশাই করেছেন কী? বলবেন তো। ডেঞ্জারাস লোক মশাই। লোককে দেখায় হিরের, ব্যবসায়ী আসলে একটা স্মাগলার, ওর আরও দুই নম্বরি ব্যবসাও আছে।'

'সে আর বলতে, কাল তো আমায় উইলের জন্য এক লাখ টাকা অফার করলেন।'

`বলেন কী?'

'হুম, তবে এখনই কিছু করতে যাবেন না। তাতে জীবনলাল অ্যালার্ট হয়ে যাবে।'

'বেশ তাই হবে।'

'বাকী ইনফরমেশন?'

'হ্যাঁ বলছি। অঙ্কিতাদেবীকেও প্রমথেশ বাবু নিজে পছন্দ করে এনেছিলেন। উনিও গরীব ঘরের মেয়ে। বাবা বরাহনগর বাজারে আলু বেচত। তবে শেষ কয়েকমাস প্রমথেশবাবুর সাথে অঙ্কিতাদেবীর সম্পর্ক ভালো ছিল না।'

'আর শ্রীপর্ণাদেবী?'

'কলেজে পড়াকালীন ভালোবেসে বিয়ে। বিয়ের এবছরের মধ্যেই স্বামীসমেত এ বাড়িতে হাজির।'

'পার্থবাবু আগে কী করতেন?'

'ওর ও পৈতৃক ব্যবসা ছিল। ধার দেনা করে, ফূর্তি করে সব উড়িয়ে সোজা এখানে।'

'চাঁদনির ইলেকট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসাটা চলে ভালো?'

'ওই চলে যাচ্ছে একরকম। এখানে এসেও তো ধার দেনা করেছে। রেসের মাঠের আর জুয়ার শখ আছে এনারও।'

'নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ?'

'তা তো বলতে পারি না। তবে খবর তো কিছু নেই সেরকম।'

'সেদিন অমরেশকে বাড়ির দরজা কে খুলে দিয়েছিল?'

'অমরেশের মা সীমা দেবী।'

'নন্দনাদেবীকে কখন ডাকতে পারবেন? '

'আপনি যখন বলবেন।'

'বেশ কাল সকাল এগারোটায় ডাকুন। ওহ বলতে ভুলে গেছিলাম, আমি অতীনবাবুর হাত দিয়ে একটা মরা মাকড়সা পাঠিয়েছিলাম, সেটার অ্যানালিসিস হয়েছে।'

' ওহ হ্যাঁ তাই তো। মনেই ছিল না। রিপোর্ট তো কালই এসেগেছিল। এ - - এই যে।' বলে ধূর্জটিবাবু তার শার্টের বাঁ পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বিজয়ের দিকে এগিয়ে দিল। বিজয় বেশ কিছুক্ষণ সেটা উল্টে পাল্টে দেখে ধূর্জটিবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ। লাইক প্রমথেশবাবু, এটার রিপোর্টও সেই inconclusive

'আচ্ছা আপনি কি মাকড়সা দিয়েই এই কেস সলভ করবেন নাকি? '

'মাকড়সা ও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ধূর্জটিবাবু। সঠিক সময় বুঝতে পারবেন। '

'তাই হবে।'

'এখন? 'সিগারেট ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করলেন ধূর্জটিবাবু।

'রিজেন্ট ক্লাব চেনেন?'

'বিলক্ষণ।'

রাসবিহারী মোড় থেকে থেকে গড়িয়াহাটের দিকে কিছু এগোতে দেশপ্রিয় পার্কের একটু আগে একটি ঝাঁ চকচকে ক্লাবের সামনে যখন গাড়ি থামল, বুঝলাম গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। ঘড়িতে তখন আটটা দশ। অভিজাত ও বড়লোকদের পসার সবেমাত্র জমতে শুরু করেছে। আর কিছুক্ষণ পর জায়গাটা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যাবে। দেদার পয়সা উড়বে। মদের গন্ধে জায়গাটা ম-ম করবে। আমরা যখন ওখানে পৌঁছালাম শতরূপ দত্ত তখনও আসেননি। ধূর্জটিবাবু আমাদের দাঁড়াতে বলে ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে গেলেন, আমরা বড়লোকের কলকাতাকে দেখতে থাকলাম। সে কলকাতার উচ্ছ্বাস, আবেগ, পরাজয় অন্যরকম। পাশের ককটেল কাউন্টারে বার টেন্ডার অতিথিদের একের পর এক মদ্যপানীয় সার্ভ করছে। হঠাৎ পিছন থেকে একটা চেনা আওয়াজ, 'আরে বিজয় বাবু, আপ ইখানে? কেয়াবাত।'

'আপনাদের ক্লাবটা একটু দেখতে এলাম। '

'বাহ ইয়ে তো বহত আচ্ছা কাম করেছে আপ। আসেন না, উপরে হামার টেবিলে চোলেন?'

'না ঠিক আছে। এখান থেকেই দেখতে ভালো লাগছে।'

'আরে আজ আপ হামার মেহমান। মেহমানের খাতির না করলে ঈশ্বর পাপ দিবে।'

'আমি ও রসে বঞ্চিত।'

'যাহ।আপনি শরাব খান না? আচ্ছা আপ তো খাবেন।' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল জীবনলাল। জীবনলাল যে এই ক্লাবে প্রতিদিন আসে তা আমরা জানতাম। কিন্তু এভাবে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাবে এই ধুরন্ধর লোকটার সাথে, কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পারিনি। ওর প্রস্তাব পেয়ে মনে মনে ভাবছিলাম এই লোকটার সাথে এক গ্লাস জলও খাব না আমি। প্রস্তাব সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'আজ নয় জীবনলালজী। অন্য কোনোদিন।'

'বেশ। এক দান তাস হয়ে যাক?'

বিজয় বলল, 'না, আমরা তাস খেলতে জানি না।' অথচ আমি জানি, তাসের চোদ্দরকমের খেলা বিজয় জানে। ওর মনে টোয়েন্টি নাইন আমাদের তল্লাটে কেউ খেলতে পারে কি না সন্দেহ। তো জীবনলাল মুখে একটু বিরক্তি নিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে ইয়ে ভি না। আপলোগ বহত নিরস ইনসান আছেন বিজয় বাবু।'

'তা একটু আছি। আপনিও ওপরে যান জীবনলালজী। আমাদের নিয়ে আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না।'

'নেহি নেহি ও বাত নেহি। আচ্ছা অমরেশ তো ধরা পড়েছে। ওই কি খুনি?'

'এখনই সেটা বলা যাচ্ছে না। আর আপনি তো সব খবরই রাখেন দেখছি।'

'কি করব বলুন। ইন্টারেস্ট ভেস্টেড আছে তো।'

'আমার অফারটা মনে আছে তো?' একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল জীবনলাল। '

'হুম আছে। তবে আমার উত্তর বদলাবে না, সেটা আশা করি বুঝেছেন।'

'পয়সা থাকলে অনেক কিছু হয়। স্যার আপনি আমার কামটা করলে, আমার কাম তাড়াতাড়ি হতো, এই যা।'

'বুঝেছি।আপনার বন্ধু কোথায়?'

'আসবে, আসবে। বন্ধু কি আমার একটা বিজয়বাবু? অনেক আছে। '

'সে তো নিশ্চয়ই।'

'ওকে বিজয় বাবু, আমায় এবার থোরা ওপরে যেতে হবে। ফের দিখা হবে। '

'হ্যাঁ আসুন। নমস্কার।'

জীবনলাল তার এক চ্যালাকে নিয়ে উপরে উঠে গেল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম যে যার জন্য আসা তিনা কখন আসবেন বা তার সাথে আজ আদৌ দেখা হবে কি না। একথা-সেকথা করতে করতে হঠাৎ ধূর্জটিবাবুর আবির্ভাব।

'কি কিছু জানতে পারলেন?' বলল বিজয়।

'না, তেমন কিছু নয়। শতরূপবাবু জীবনলালের সাথে এখানে আসেন প্রতিদিন। আজ অবশ্য এখনও এসে পৌঁছাননি। নেই গড়ে ত্রিশ – পঞ্চাশ হাজার টাকার খেলেন প্রতিদিন। কখনও কখনও জেতেন, কখনও হারেন।'

'বাহ । সোনার টুকরো ছেলে। আর কিছু?''

'না আর কিছু তো... ওহ হ্যাঁ, গত সপ্তাহে নাকি শতরূপবাবুর সাথে জীবনলালের ঝামেলা হয়েছিল ক্লাবে।'

'কি নিয়ে ঝামেলা? '

'ওই টাকা-পয়সার হিসেব, বুঝলেন। জীবনলাল হয়তো পয়সা চেয়েছে। শতরূপ বাবু মদের ঘোরে ভুলভাল কিছু বলেছে, এই নিয়ে যত ঝামেলা।'

'আচ্ছা সেবার বয়টা ওদের টেবিলে সার্ভ করে, ওর সাথে একটু কথা বলা যায়?'

'দাঁড়ান দেখছি।'

'ধূর্জটিবাবু ভিতরে ম্যানেজারের ঘরের দিকে, যেটা প্রকাণ্ড ককটেল কাউন্টারের পরে হঠাৎ ক্লাবের সদস্যদের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিট পর ম্যানেজার ও আরও একটি লোককে, সম্ভবত ওয়েটার নিয়ে এলেন, ম্যানেজারের সাথে আলাপ করার পর বিজয় ওয়েটারকে প্রশ্ন করতে শুরু করল, 'তুমি জীবনলালকে চেনো?'

'হ্যাঁ চিনি স্যার। প্রতিদিন ওনার টেবিলেই আমার ডিউটি থাকে তো।'

'শতরূপবাবুকে চেনো?'

'চিনি স্যার। উনি ও ওই টেবিলে থাকেন।'

'আর কে কে থাকেন?'

'অসীম কাপুর থাকেন, বিনোদ টোডি থাকেন প্রকাশ মুখার্জি থাকেন আর মাঝে মাঝে বিশাল মানিক আসেন।'

পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলে রাখা ভাল এই যাদের নাম ওয়েটার নিল, তারা এই শহরের অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি। সবাই খুব সফল ব্যবসায়ী। সবাই প্রায় তিন দশক ধরে কলকাতায় ব্যবসা করছেন। বেঙ্গল চেম্বারস অফ কমার্সের অতি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওয়েটার এক এক করে নাম বলছিল আর ধূর্জটিবাবু একটু একটু করে ঢোঁক গিলছিলেন। কারণ এরা অত্যন্ত পাওয়ারফুল

লোক। যদি ভুলবশতঃ কারোর গায়ে হাত লাগে, ধূর্জটিবাবুকে যে সুদূর বেলদা বা সোনামুখীতে ট্রান্সফার হতে হবে একথা তিনি খুব ভালোই জানেন।

'আর অন্য কেউ?' বিজয় বলল।

'না, স্যার অন্য কারুর ওপরের ওই ব্লকে এন্ট্রির পারমিশন ছিল না।'

'গত সপ্তাহে জীবনলালের সাথে শতরূপবাবুর ঝামেলা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ স্যার তুমুল ঝামেলা। কি একটা কথা নিয়ে ওনাদের মধ্যে খুব ঝামেলা হয়েছিল। পুরো ক্লাবের লোক জড়ো হয়ে গেছিল।'

'ঠিক কি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল মনে আছে?'

'টাকা নিয়ে স্যার। জীবনস্যার বলছিলেন, 'টাকাও দিলাম অউর কামটাও হল না এটা, কিন্তু ফেয়ার ডিল হল না। তোমার থেকে অন্য কাউকে কাজটা দিলে ভালো হতো।' এইসব।

'আর কিছু?' এমন কিছু যেটা অস্বাভাবিক বা অন্য রকম লেগেছে?'

'না স্যার। তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'আরেকটু ভাবো।'

ওয়েটারটা অনেকক্ষণ ভেবে হঠাৎ বলল, 'হ্যাঁ স্যার একটা লোক এসেছিল। জীবনস্যারদের ব্লকে যেতে চাইছিল। পারমিশন ছিল না বলে যেতে দিই নি।'

'তারপর? '

'জীবন স্যার তখন একা ছিলেন। লোকটা আমার হাতে দু'হাজার টাকার একটা নোটও দিয়েছিলেন। আমি প্রথমে নিতে চাইনি। জীবনস্যার একা থাকলে কারো সাথে দেখা করা পছন্দ করেন না।'

'তারপর তুমি টাকাটা নিয়েছিল? '

'গরীব মানুষ স্যার। দু'হাজার টাকার অনেক দাম আমার কাছে। তাই ওনার জেদাজেদিতে নিয়ে নিয়েছিলাম।'

'তারপর লোকটাকে দেখা করতে দিয়েছিলে? '

'না। বললাম, আপনার কোনও মেসেজ দেওয়ার থাকলে লিখে দিন স্যার অ্যালাউ করলে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা শতরূপবাবু ওই দিন আসেননি?'

'না স্যার। উনি রোববার আসেন না।'

'বেশ তারপর?'

'জীবনস্যারকে চিরকুটটা দিতে জীবনস্যার ইমিডিয়েট ওকে পাঠাতে বললেন।'

'কতক্ষণ কথা হয়েছিল ওদের?'

'উমম্ আধঘন্টা তো হবেই।'

'লোকটাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

'পারব স্যার।'

'আচ্ছা লোকটার কথাবার্তা শুনে কী মনে হচ্ছিল?' লোকটাকে আগে কোনদিনও দেখেছিল?'

'না স্যার আগে কখনও এখানে দেখিনি। উনি পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছিলেন স্যার।'

'বেশ তোমার ছুটি। তুমি যেতে পারো।'

ওয়েটার চলে যেতে বিজয় সেন অদ্ভূত এক চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতে লাগল যেন। ধূর্জটিবাবু আর থাকতে না পেরে বললেন, 'কিছু ধরতে পারলেন না কি?'

'না, একটা কো – ইনসিডেন্স নিয়ে ভাবছি। হয়তো কোনো কানেকশন নেই। আবার থাকতেও পারে।

'কোনটা বলুন তো?'

'ওই আগন্তুক জীবনলালের কাছে কবে আবির্ভূত হয়েছিল?'

'ওই তো রবিবার।'

'আর প্রমথেশ দত্ত খুন হয়েছেন?'

'গত পরশু। মানে সোমবার।'

'খুনের আগের দিনই কেন? '

'লিংক আছে বলছেন?'

'সম্ভাবনা তো থেকেই যায়। যাক গে চলুন যাওয়া যাক। এখানের কাজ শেষ আপাতত।'

আমাদের পাড়ার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে ধূর্জটিবাবু একটা গুডনাইট বলে বিদায় নিলেন। রাত তখন পৌনে দশটা। পাড়ায় ঢুকে বিজয় নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে সোজা আমার বাড়ির দিকে বাঁক নিল। ওকে সেই 'রিজেন্ট ক্লাব' থেকে বেরোনোর ইস্তক দেখছি গাড়িতে এতটা রাস্তা কোন কথা বলেনি। চুপচাপ, আপন মনে কী যেন ভেবে চলেছে। আশ্চর্যরকমের গাম্ভীরতা গ্রাস করেছে যেন। আমার ঘরে ঢুকে ফ্যানটা চালিয়ে গা-টা খাটে এলিয়ে দিল বিজয়। শুয়েই বলতে লাগল, যেন মনে হল হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। এতক্ষণ পর ছেলেটা আবার কথা বলল।

'তিনটে জিনিস খুব খটকা লাগছে রে ভাই।'

'কি কি?'

'খটকা নম্বর এক - যে ঘরে প্রায় সর্বক্ষণ এসি চলে সকালে, সে ঘরের জানলা খোলা থাকে কেন?'

'খটকা নম্বর দুই- প্রমথেশবাবুর শরীরে কোনও চেতনানাশক বা বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না কেন?'

'আর খটকা নম্বর তিন....'

'কী'

'ওটাই সবথেকে বড় ধাঁধা।'

'কী বলবি তো?'

'নাহ, নতুন করে আবার শুরু করতে হবে। পুরো ঘেঁটে গেছে।'

'বেশ উঠবি তাহলে?'

'আজ রাতে মাথার প্রচুর ব্যায়াম আছে' বলে বিজয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

'কী হল জানাস।'

বিজয় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল। রাতে নতুন পোর্ট্রেটটা নিয়ে বসেছি, রাত প্রায় বারোটা হবে, আমার মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। ফোন তুলে দেখি ফোনের ওপরে বিজয়। বিজয় যা বলল তার মোটামুটি সংক্ষেপিত হল-

'অমরেশ ধরা পড়েছে।'

'কবে? কোথায়? কখন?'

'আজ রাতে চিনে পাড়ার একটা ঠেক থেকে নারকোটিকসের হাতে।'

'বাহ।'

'কাল সকাল ন'টায় ধূর্জটিবাবু টাইম দিয়েছেন। তুই যাবি তো?'

'হ্যাঁ যাব।'

'সাড়ে আটটায় পাড়ার মোড়।'

'ওকে' বলে ফোনটা কেটে দিলাম।

মনে মনে ভাবলাম অমরেশ ধরা পড়েছে মানে তো তদন্তের অনেক দিক এখন খুলে যাবে। উত্তেজনাও শিহরণে। সারারাত আমার ঘুম এল না। ঘুম এল যখন যখন বাইরের সকালের আলো ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো কখন বুজেছিলাম জানিও না। ঘুম ভাঙলো আমার ঘরে থাকা পুরানো ওয়ান শাটার অ্যালার্ম ঘড়ির কান ফাটানো আওয়াজ। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে টোস্ট – ওমলেট খেয়ে পাড়ার মোড়ে পৌঁছে দেখি বিজয় আগে থেকে এসে হাজির। হেসে একে অপরকে গুড মর্নিং বলে লালবাজার রওনা দিলাম আমরা।

আমরা লালবাজার যখন পৌঁছলাম পথে তখন স্কুলমুখী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের দখলে চলে গিয়েছে গোটা এলাকা। শিয়ালদহ রেলস্টেশন আর সেন্ট্রাল মেট্রো থেকে কাতারে কাতারে অফিসযাত্রী অফিস পাড়ার দিকে ধাবমান। সবমিলিয়ে লালবাজার-ডালহাউসি চত্বর জমজমাট দিনের এই সময়।

আমরা লালবাজার পৌঁছে, গেটে একটা ষন্ডামার্কা পুলিশকে নারকটিক্স ডিপার্টমেন্ট জিজ্ঞেস করায়, সে সোজা গিয়ে বাঁ দিকের একটা লিফ্ট দেখিয়ে দিল। আমরা লিফটে করে পাঁচতলায় যে ঘরে অমরেশকে রাখা ছিল, সে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরটা খুঁজতে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হল না। ঘরে ঢুকে দেখলাম, ধূর্জটিবাবু আগে থেকে ওখানে বসেছিলেন। আমরা যেতে হেসে গুড মর্নিং বলে চা অফার করতে, বিজয় অতি বিনম্রতার সাথে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে বলল' চলুন অমরেশের সাথে আলাপটা সেরে নি।'

ধূর্জটিবাবু আমাদের ইন্টারোগেশন রুমে নিয়ে গেলেন। পরিসরে ঘরটা খুব বড় না হলেও এ ঘরে আলো-বাতাস খুব একটা ঢোকে না। ওই ঘরেরই এক পাশে একটা কোনায় একটা যুবক চুপচাপ বসেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল বেশ কিছুদিনের অভুক্ত। চোখেমুখে যে ক্লান্তি আর ভীতি উভয়েরই ছাপ পড়েছে। ধূর্জটিবাবু ঘরে ঢুকতেই যুবককে কলার ধরে টেনে তুললেন, যুবকটি অপ্রস্তুত ও ভীত হয়ে পড়ল।

ধূর্জটিবাবু বললেন 'এই যে এই বাবু তোকে এখন কিছু প্রশ্ন করবেন। ঠিকঠাক উত্তর না দিলে তোর খাওয়া বন্ধ।'

'না স্যার যা জানতে চান সব বলব।'

'অমরেশ তোমার কটা সেমিস্টার বাকি?' প্রশ্ন করল বিজয়।

'আরও দুটো।'

'শব ব্যবচ্ছেদ করতে পার? '

'পারি।'

'দাদু খুন হয়েছে যে, জান?'

'পরেরদিন খবরের কাগজে পড়েছিলাম।'

'এতদিন কোথায় ছিলে?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর উত্তর এল 'পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম স্যার।'

'কেন?'

'খবরের কাগজে সাসপেক্ট হিসাবে আমার নাম ছিল, কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত না স্যার। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'দাদুর সাথে সেদিন কি কথা হয়েছিল?'

'টাকার দরকার ছিল স্যার, তাই চাইতে গেছিলাম।'

'পেয়েছিল?'

'না স্যার। দাদু দেয়নি। উল্টে আমায় অপমান করল।'

'আর তোমার মাথা গরম হল আর তুমি খুনটা করে দিলে।'

'না, না , না, এসব আপনি কি বলছেন? আমি কাউকে মারিনি।'

'তোমারও বাড়িতে ঢোকা আর বেরোনো ইস্তক অন্য কেউ আমায় দেখেছিল?'

'বলতে পারবো না স্যার। আমিতো কাউকে দেখিনি, মা ছাড়া।'

'তোমার কাছে সার্জিক্যাল কিট আছে?'

'আছে।'

'সেটা এখন কোথায়?'

'বাড়িতে আমার ঘরে বুকশেলফের মাথায় রাখা থাকে।'

'একটু ভেবে বলতো দাদুর ঘরে যখন ঢুকেছিলে, কিছু অস্বাভাবিক লেগেছিল?'

'না তো সব নর্ম্যাল।'

'তুমি আন্দাজ কটা নাগাদ বাড়িতে গিয়েছিল?'

'একটা-দেড়টা হবে স্যার।'

'আর খুনের সময় দেড়টা থেকে দুটো। তুমি জানো তোমার দাদুকে কেউ অচৈতন্য অবস্থায় কোনও একটা শার্প ইন্সট্রুমেন্ট দিয়ে খুন করে?'

'না আমি জানিনা। আমি কিছু জানিনা।' এই বলে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রকৃতস্থ আচরণ করতে থাকে অমরেশ। সে যেন এক বদলে যাওয়া মানুষ। সে ওই অবস্থাতেই আরও বলতে থাকে 'আপনারা যত চেষ্টা করুন আমাকে আপনারা দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। আমি খুন করিনি। আমি খুনি নই।' বলে অমরেশ নিজেই নিজের মাথাটা দেওয়ালে ঠুকতে থাকে। পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে ধূর্জটিবাবু প্রায় এক হাতে নিরস্ত করে মাটিতে বসিয়ে দেন। ওদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ মল্ল যুদ্ধের পর একটু প্রকৃতস্থ হলে তাকে প্রশ্ন করে 'তুমি ও ঘর থেকে বেরোনোর সময় কাউকে দেখেছিল?'

'না, স্যার বারান্দা অন্ধকার ছিল।'

'তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না।'

'বেশ। আজ এই অবধি।'

কথার পালা শেষ করে, আমরা লালবাজারের বাইরে এসে ধূর্জটিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদনির গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম। গন্তব্য পার্থবাবুর দোকান। দোকানটা চাঁদনীচক মোড়ের ঠিক বাঁ-দিকে ই-মলের পাশের গলিতেই। আমরা যথারীতি গাড়ি থেকে নেমে দোকানের দিকে অগ্রসর হতেই পার্থবাবু নিজের দোকানের কাচের দরজা খুলে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। দোকানের ভেতর থেকে বাইরেটা বেশ ভালোই দেখা যায়। আমরা দোকানে ঢুকতেই পার্থবাবু তার কাজের ছেলেটিকে তিনটি কোলড্রিংস আনতে বলে আমাদের বসার জন্য অনুরোধ করলে।

'বলুন কী ব্যাপার?'

'আপনার দোকান দেখতে এলাম। এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম তাই।'

'ভালোই তো করেছেন।'

'বাইরে থেকে দেখে দোকানটা যতটা সাধারণ বলে মনে হচ্ছিল দোকানের ভিতর রাখা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসি, মাইক্রোওভেন, মোবাইল দেখে সে ধারণা অচিরেই বিলিয়ে গেল। বেশ সাজানো দোকান। দোকানের কর্মচারী ও খোদ্দেরের অনুপাত দেখে আমদানি খারাপ বলে তো মনে হয় না। তাও কি করে উনি ধার দেনা করে বেড়ান সেটাই আশ্চর্যের। বিজয় ফের শুরু করল –

'আচ্ছা পার্থবাবু, আপনার শ্বশুরকে কে বা কারা খুন করতে পারে বলে মনে হয়?'

'তা তো ঠিক বলতে পারব না। ওনার ব্যবসায়িক কোনও শত্রু ছিল কিনা জানি না।'

'আপনি তো ও বাড়িতে এতদিন হল আছেন, আপনার কিছু.....' কথাটা বলতে বলতে বিজয়কে দেখলাম দেওয়ালে রাখা একটা ছবির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে। ওর কথা আর শেষ হল না, বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বিজয় বলতে শুরু করল, 'এই ছবি টা?'

'ও এটা? কলেজ লাইফের। পিকনিকের। চেনেন না কি কাউকে?'

'না, একজনকে খুব চেনা চেনা লাগল তাই।'

'ও আচ্ছ।'

'আচ্ছা, যদি আপনার শ্বশুরের কোনও উইল না থেকে থাকে, তাহলে তো সম্পত্তি তিনটে সমানভাগে ভাগ হবে?'

'হবে হয়তো।'

'আপনার স্ত্রী-এর অংশে যেটা আসবে সেটা বোধ করি কম কিছু নয়।'

'আমি জানি আপনি কি বলতে চাইছেন।কিন্তু খুনটা আমি করিনি।'

'সেটা ধূর্জটিবাবু ঠিক জেনে নেবেন। কি ধূর্জটিবাবু? '

ধূর্জটিবাবু একাগ্র মনে একটি টিভিতে হয়ে চলা 'কহোনা পেয়ার হে' দেখেছিলেন। বিজয় প্রশ্ন শুনে একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'কিছু বললেন না কি মশাই?'

'কিছু না। চলুন এবার ওঠা যাক।' বলল বিজয়। আমরা আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়লাম। এর পরের গন্তব্যস্থল লেক থানা। সেখানে আমাদের আরেকজন সন্দেহভাজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, নন্দনা দত্ত, প্রমথেশ দত্তের নাতনি ও শতরূপ দত্তের একমাত্র কন্যা। আমরা যখন লেক থানায় ফিরলাম, বেলা প্রায় বারোটা। বাইরে রোদের তেজ বেশ ভালোই, ধূর্জটিবাবু ফিরে তো একজন কনস্টেবলকে তিনটে চায়ের অর্ডার দিয়ে, আমাদের সাথে করে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। ধূর্জটিবাবুর চেয়ারের ঠিক এ পাড়ে এক কিশোরী বসে। কালো টপ আর জিনস পরিহিতা। মুখশ্রী লাবণ্যে ভরপুর। ঠিক যেমনটা শতরূপবাবুর স্ত্রী অঙ্কিতাদেবীকে দেখে মনে হয়েছিল, হবহু এক, সত্যি মা ও মেয়ে অসামান্য সুন্দরী। একথা - সেকথা ভাবছি হঠাৎ মহিলার শাসানিতে ঘোর কাটল-' আপনারা কী ভেবেছেন কী? আমি লাস্ট আধঘন্টা ধরে বাইরে বসে আছি। আমার তো তারও কাজ আছে নাকি?'

এক অদ্ভুত বাঁকা হাসি নিয়ে বিজয় বলল, 'আপনি জানেন!? আপনাকে কেন এখানে ডাকা হয়েছে?'

'দাদুর মার্ডার নিয়ে প্রশ্ন করবেন তো? সো হোওয়াট? আই ডিড নট ডু দ্যাট।'

'সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। আপনি কি এই খুনের ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করতে পারেন?'

'সার্টেনলি নট।আপনাদের যা প্রশ্ন আছে তাড়াতাড়ি করুন, আমার তাড়া আছে।'

'কথা দিচ্ছি আপনার বেশি সময় নেব না।'

'বেশ বলুন।'

'খুনের দিন রাতে আপনি কি করছিলেন?'

'রোজ আফটার ডিনার যা করি, ঘন্টাখানেক গিটার বাজাই।'

'সেদিনও তাই করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঘুমালেন কখন?' '১২:৩০-১টা হবে। ঠিক মনে নেই।'

'কখন খবরটা পেলেন?'

'সকালে মা ঘুম থেকে তুলে খবরটা দিলেন।'

'আপনার বয়ফ্রেন্ড আছে?'

'সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে জানাতে বাধ্য নই।'

'আপনি কি পড়ছেন?'

'ক্লাস টুয়েলভ দেব।'

'আপনার দাদুর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?'

'গত দুমাস ধরে দাদুর সাথে আমার কোনো কথা হতো না।'

'কেন?'

'সেটা দাদুই ভালো বলতে পারতেন।'

'মানে হঠাৎ করে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন?'

'হ্যাঁ ওরকমই খানিকটা।'

'আপনি দাদুর কাছে জানতে চাননি এর কারণ?'

'প্রথম প্রথম গিয়েছিলাম। দাদু কিছু বলতো না দেখে আমিও আর ঘাঁটাইনি।'

'আপনি হাত খরচ পান?'

'পাই।'

'কে দেয়?'

'দাদু-ই দিত। মাসে মাসে একটা ফিক্সড টাকা আমরা সবাই পেতাম।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ মানে বাড়ির সব মেম্বারসরা।'

'আর আপনার বাবা?'

'এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি খুব জরুরী?'

'দিলে ভালো হতো, না হলে আমাদের কাজ বাড়বে।'

'বাবা আমায় খুব একটা পছন্দ করতেন না।'

'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনার দাদুও শেষ সময় আপনার সাথে কথা বলতেন না। আপনার বাবা আপনাকে পছন্দ করেন না।'

'আমি জানি না। এসব কথা আপনি আমার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।'

'উত্তেজিত হবেন না। প্লিজ বসুন। একটু জল খান।' বলে বিজয় টেবিলে রাখা জলের গ্লাস নন্দনার দিকে বাড়িয়ে দেয়। নন্দনা সেই গ্লাসের প্রায় প্রায় অর্ধেক জল খেয়ে একটু শান্ত হল বলে মনে হল।

'শেষ প্রশ্ন নন্দনাদেবী, আপনার সাথে আপনার দাদার সম্পর্ক কীরকম?'

'দাদা খুব ভালো মানুষ বিজয়বাবু। দাদা এটা করতে পারে না। কী জানেন বিজয়বাবু আমাদের অভিভাবকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আর আমাদের প্রতি উদাসীনতাই আজ আমাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী। কিন্তু বিশ্বাস করুন খুনটা কিন্তু আমরা কেউ করিনি।'

'বেশ আপাতত বিশ্বাস করলাম। আপনি এখন আসতে পারেন।'

নন্দনা বেরিয়ে যেতে বিজয়কে প্রশ্ন করলাম 'কী বুঝলি?'

বিজয়ের উত্তর আসলো 'কেসটা আরও জটিল হচ্ছে। ধূর্জটিবাবু উইলের ব্যাপারটা কতদূর কী এগল?'

'হ্যাঁ। ওনার সলসিটরের সাথে কথা হয়েছে। উনি কাল কলকাতা ফিরছেন। উনি ফিরলেই কথা বলব।'

'আপনাকে কয়েকটা কাজ দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি করলে ভালো হয় আর কি।'

'বেশ তো বলুন।'

'ত্রিপাঠি মেডিক্যাল কলেজের ১৯৯৮ সালের সমস্ত স্টুডেন্টসদের ইনফরমেশন চাই আর অমরেশের ঘর সার্চ করে দেখবেন তো ওর সার্জিক্যাল কিটটি পাওয়া যায় নাকি।'

চমকে উঠলাম আমরা-তাহলে কি বিজয় আসল অপরাধীকে খুঁজে পেয়ে গেছে? নাহলে হঠাৎ ত্রিপাঠি মেডীক্যাল কলেজের ১৯৯৮ সালের সমস্ত স্টুডেন্টদের লিস্ট চাইবে কেন। থাকতে না পেরে আমিই প্রশ্নটা করলাম 'তুই কি ধরে ফেলেছিস আসল খুনি কে?'

'না শুধু সব সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখছিমাত্র।'

'ত্রিপাঠি মেডিক্যাল কলেজ কেন হঠাৎ?'

'ত্রিপাঠি মেডিক্যাল কলেজেই অর্ধেক উত্তর লুকিয়ে।'

'আর বাকিটা?'

'বাকিটা একটু খাটাখাটনির ব্যাপার আছে। প্রমাণ যোগার করার ব্যাপার আছে।'

'তুই তাহলে এখন কী করবি?'

'আমি একটু শহরের এদিক ওদিক করব। বেশ কিছু কসরৎ আছে। তুই এক কাজ কর, দত্তবাড়ি যা, গিয়ে আরেকবার সবার সাথে কথা বল আর দত্তবাড়ির ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের নামটা জেনে তার সাথে দত্তবাড়ির সব সদস্যদের সম্পর্কে ডিটেইলস নিয়ে রাতে আমায় রিপোর্ট করবি।'

'আর তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'ওই বাকি অঙ্কটা মেলাতে, ধূর্জটিবাবু আমায় কাছকাছি কোনও মেট্রো স্টেশনে নামিয়ে দিতে পারেন?'

'সার্টেনলি চলুন।'বলে ধূর্জটিবাবু বিজয়কে রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে নামিয়ে আর আমাকে দত্তবাড়িতে নামিয়ে বিদায় নিলেন। আমি দত্তবাড়িতে ঢুকতেই প্রথমে গেটের দারোয়ান আটকালো, পরিচয় দেওয়ায় অবশ্য বাঁধা দিল না। দত্তবাড়ির পুরো নকশা আমার মাথায় আঁকা ছিল, তাই কালবিলম্ব না করে সোজা মার্ডার স্পটে পৌঁছে গেলাম। তাঁর আগে অবশ্য নীচে রতনকে দেখতে পেয়ে ওকে বলা ছিল যে, আমি সবার সাথে আলাদা করে কথা বলব। দিনের এই সময় অবশ্য বিশেষ কাউকে পাওয়া গেল না। শুধুমাত্র বাড়ির দুই বউ শ্রীপর্ণাদেবী। অজিতেশবাবু আর শতরূপবাবু সকলেই নিজ নিজ দোকানে চলে গিয়েছেন, বাড়ির ছেলে অমরেশও আবার লক-আপে বন্দি। প্রথমেই দেখা হল সীমাদেবীর সাথে। একমাত্র ছেলের গ্রেপ্তারি ও শ্বশুরের মৃত্যুতে গত কয়েকদিনে খুব চিন্তিত ও হতাশ। যদিও সেই শোকের মধ্যেও দুপুরের খাওয়া দত্তবাড়িতে সারার প্রস্তাব দিলেন। আমি অতি বিনয়ের সাথে সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম। উনি বললেন 'সবাই মিলে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে অনুজবাবু।'

'এরকমটা ভাবার কোনও কারণ নেই। ও যদি কিছু না করে থাকে তাহলে ওর কিছু হবে না। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

মহিলা চোখের জল মুছে বললেন 'বলুন।'

'আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না অনুজবাবু। বাড়ির লোককে কি সন্দেহ করব?'

'বাইরের লোক কেউ?'

'জীবনলাল করলেও করতে পারে, ওর সাথে বাবার তো বহুবার তর্কাতর্কি হয়েছে।'

'এ বাড়িতে যে চুরিটা হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন?'

'ও-তো জীবনলাল-ই করিয়েছিল।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'এতে আর জানার কী আছে বলুন। বাড়িসুদ্ধু লোক জানে। অবশ্য এরকম বিভীষণ যদি থাকে।'

'শতরূপবাবু?

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে এই পরিস্থিতিতে আর বিরক্ত করব না।আপনি আসতে পারেন।'

সীমাদেবীর মানসিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় বলে তাকে আর অহেতুক বিব্রত করা শ্রেয় বলে মনে করলাম না। প্রমথেশবাবুর ঘরে একটা 'দি মার্ডার বুক' ছিল, এটা আমি যেদিন প্রথম দত্তবাড়ি আসি, সেদিনও লক্ষ্য করেছিলাম। ওটাই আজ সুযোগ থাকায় উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলাম। ঠিক এমন সময় চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন শ্রীপর্ণাদেবী। সহসা তাঁর আগমনে বইটা

যথাস্থানে রেখে তাঁকে বসতে বলে নিজে একটা চেয়ার টেনে বললাম 'কিছু প্রশ্নের জবাব খোঁজা দরকার হয়ে পড়েছে।', কথাটা শেষ করার আগেই উনি বললেন 'না, না ঠিক আছে বলুন।'

'পুলিশ তো শুনলাম অমরেশকে ডিটেইন করেছে। ওই কি তাহলে?'

'না। সেটা তদন্তসাপেক্ষ।'

'ওহ।'

'আপনার অন্য কাউকে সন্দেহ হয়?'

'এ বাড়ির কেউ এরকমটা করবে বলে তো মনে হয় না, তবে জীবনলাল লোকটাকে আমার একদম ভালো লাগে না, এক নম্বরের বদমাইশ, ছোড়দা কেন যে...'

'আপনাদের বাড়িতে চুরিটা...'

'জীবনলালই করিয়েছিল।'

'কেন?'

'বাবা ওকে দোকানটা বেচবে না বা ছোড়দাকেও দেবে না বলে দিয়েছিল তাই।'

'আপনি কী করে জানলেন?'

'বাবা বলেছিল একদিন।'

'আর কিছু বলেছিলেন?'

'না, বাবা খুব আপসেট থাকত। ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়েও শেষ কয়েকমাস খুব খিটখিট করত।'

'উনি কি এরকমই ছিলেন?'

'না একদমই না। বাবা খুব মিশুকে হাসিখুশি লোক ছিলেন।'

'তাহলে এরকম চেঞ্জ হল কেন?'

'নো ক্লু।'

'আচ্ছা শেষ প্রশ্ন। আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের নামটা?'

'ডঃ সেনশর্মা। কাছেই থাকেন।'

'ধন্যবাদ।'

শ্রীপর্ণাদেবী নমস্কার করে উঠে চলে গেলেন। শ্রীপর্ণাদেবীকে অবশ্য যাওয়ার আগে বলে দিয়েছিলাম উনি ফিরে যেন অঙ্কিতাদেবীকে পাঠিয়ে দেন; অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই অঙ্কিতাদেবী এলেন। সেই করুণ লাবণ্য আর সম্মোহনে ভরপুর মুখশ্রী। যে কোনও পুরুষ এনার

জন্য পাগল হতে পারে। কিছুক্ষণের সম্মোহন কাটিয়ে ওনার সাথে কথা বলা শুরু করলাম- 'আপনাকে শুধু দু-তিনটে প্রশ্ন করব।'

'করুন।'

'আপনার স্বামীর সাথে আপনার শ্বশুরের কী নিয়ে মতানৈক্য?'

'ওই চারু মার্কেটের দোকানটা নিয়ে।'

'আপনি জানেন আপনার স্বামী কী করে বেরান?'

'এত বছর ঘর করছি, এটা জানব না? সব জানি।'

'জীবনলালকে চেনেন?'

'চিনি, আমার স্বামীর বন্ধু, এ বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছে।'

'জীবনলালকে সন্দেহ হয় আপনার?'

'বলতে পারব না।'

'আপনার মেয়ের সাথে প্রমথেশবাবু কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন?'

'জানি না, তবে শুরু থেকে এরকম ছিল না জানেন।'

'আর আপনার স্বামীর সাথে মেয়ের সম্পর্ক কীরকম ছিল?'

'মানে?'

'আপনার মেয়ে বলেছিল আপনার স্বামীও নাকি আপনার মেয়েকে ঠিক পছন্দ করতেন না?'

'কই না তো। সেরকম কিছু তো নয়।'

'কিছু লুকোবেন না। সত্যিটা বলুন প্লিজ।'

'সত্যি বলছি।'

'আপনারা ডঃ সেনশর্মাকে দেখান তো?'

'আজ্ঞে।'

'বেশ। আপনার ছুটি।'

বাড়ির কর্তারা এই সময় কেউ বাড়ি নেই, তাই বাড়ির গৃহিণীদের সাথে কথা বলে ডঃ সেনশর্মার চেম্বারে যাব ঠিক করলাম, ঠিক যেমনটা বিজয়ের নির্দেশ ছিল। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি, একতলায় চাকর রতনকে দেখি দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম ও কিছু বলতে চায়।

'কিছু বলবে রতন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'বাবু তো চলে গেলেন স্যার। বাবুর খুনির শাস্তি হবে না?'

'হবে তো। তুমি কিছু জানো এ ব্যাপারে?'

'আমি কী বলব বাবু?'

'তুমি এই বাড়ির লোকের সম্পর্কেই বল।'

'মেজদাবাবু আর জামাইবাবু ভালো লোক নয় বাবু।'

'কেন?'

'দিদিমণি আর বৌদিমনিকে প্রায়ই মারধর করে।'

'তুমি দেখেছ?'

'না। শুনেছি। ঘরের ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ আসে।'

'আর তোমার রুমকি দিদিমণি কোনও ছেলের সাথে?'

'ফোন নিয়ে তো বসে থাকে কী করে বলতে পারব না।'

'আর অন্যরা?'

'ওরা সবাই ভালো। বড়দাবাবু আর বড় বৌদি সাক্ষাৎ মাটির মানুষ।'

'তোমার বাবুর সাথে জীবনলাল ছাড়া বাইরের লোক আর কে দেখা করতে আসত?'

'আজ্ঞে উকিলবাবু আর ডাক্তারবাবু আসতেন।'

'আর কিছু?'

'ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে বাবু।'

'আহা বলই না।'

'আমি বেশ কয়েকবার মেজবৌদির ঘরে জামাইবাবুকে ঢুকতে দেখেছি।'

'তুমি নিশ্চিত? অন্য কেউ নয়? পার্থবাবুই ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।'

'আচ্ছা রতন, ডঃ সেনশর্মার চেম্বারটা কোথায়?'

'এ তো কাছে। লেক ভিউ রোডে। হেঁটে মিনিট পঁচিশ, রিক্সাও যায়।'

রতনের কাছে দত্তবাড়ির হাঁড়ির খবর নিয়ে ডঃ সেনশর্মার চেম্বারের দিকে অগ্রসর হলাম। দত্তবাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের মোড়ের মাথায় সারি দিয়ে সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়ে। ওর মধ্যে একটাতে চেপে যখন ডঃ সেনশর্মার চেম্বারে নামছি তখন বাজে ঠিক চারটে। রিক্সাওয়ালাকে বলাই ছিল যে চেম্বার যাব তাই সে চেম্বারের সামনেই দাঁড় করিয়েছে। ডঃ সেনশর্মার চেম্বার এক মাঝারি মানের ক্লিনিক। খুব একটা যে ভালো চলে হলফ করে বলা যায় না। বাইরে সাইনবোর্ডে

বড় বড় করে লেখা 'ডঃ সেনশর্মা'স ক্লিনিক'। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে, ডাক্তারবাবুকে পেয়েও গেলাম। সবেমাত্র ভাতঘুম দেওয়ার একটা চেষ্টা করছিলেন আর কী, অসময়ে রোগী ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর চেম্বারে আসায় খানিক রুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল। তাকে মানাতে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হল না। লালবাজার থেকে আসছি শুনে সোজা হয়ে বসলেন আর আমাকেও বসতে বললেন।

'বলুন। কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'প্রমথেশবাবু মারা গেছেন শুনেছেন তো?'

'হ্যাঁ জানি। কে যেন ওনার গলা কেটে খুন করেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সেইরকম।'

'কী আর বলব। শেষ জীবনটা দুঃখ করেই কাটিয়ে দিলেন। শান্তি পেলেন না।'

'কেন?'

'এই তো উনি মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ আগেই দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই বলছিলেন।'

'কী বলছিলেন?'

'এই যে ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে, উনি অনেক বড় ভুল করেছেন। ভুল শোধরাতে হবে।'

'আর কিছু বলেছেন কী?

'হ্যাঁ। মহাভারতের কথা।'

'মহাভারত?'

'হ্যাঁ। ওই পরশুরাম-কর্ণের গল্প। কর্ণকে নিয়ে বলতেন; পরশুরামের মতো আমিও ভুল লোককে অনেকিছু দিয়ে ফেলেছি।'

'এই ভুল লোকটি কে?'

'তা তো আমি জানি না। উনি সেটা কিছু বলতেন না।'

'আচ্ছা। ওই বাড়ির সবার মেডিক্যাল রিপোর্ট আছে আপনার কাছে?'

উনি বেশ সাহেবি কেতায় নিজের তর্জনী মাথায় ঠেকিয়ে বললেন 'অল স্টোরড হিয়ার।'

'বেশ যদি ব্রিফ করে একটু লিখে দেন।'

উনি দেখলাম বেশ কিছুক্ষণ ধরে ওনার প্যাডের দু-দিকে দত্তবাড়ির সমস্ত সদস্য সম্পর্কে বেশ মনোযোগ সহকারে লিখে দিলেন। ডাক্তারদের একটা দুর্নাম আছে যে তাদের হাতের লেখা ওষুধ ব্যাবসায়ীরা ছাড়া অন্য কেউ পড়তে পারে না। আমার সে ধারণা এমন ভুল প্রমাণ হল; ডঃ সেনশর্মার হাতের লেখা খুব সুন্দর ও গোটা গোটা। যে কেউই পড়তে পারবে। উনি লেখার পর

আমি লেখাটা পড়ছিলাম। হঠাৎ একটা জায়গায় এসে চকিত ও স্তম্ভিত হলাম। তারপর ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম-

'আপনি এটা কী লিখেছেন?'

'ঠিকই তো লিখেছি।'

'আপনি সিওর? কিন্তু ওনার তো...'

কথা শেষ হল না, তার আগেই উনি বলে উঠলেন 'বয়স হলেও স্মৃতিভ্রম আমার হয়নি। ওটা ঠিকই যেটা পড়েছেন। বিয়ের পরপর উনি এসেছিলেন ওনার কিছু গোপন সমস্যা নিয়ে। তখনই টেস্টগুলো দিই। সেটাতেই ধরা পড়ে।'

'তাহলে?'

'তাহলে কী? কুন্তির সন্তানলাভ?'

এতক্ষণ যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম, গল্পের ক্লাইম্যাক্সে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তাই যথাসময় সেই কথা বলব। অতঃপর রিপোর্টটা নিয়ে রাতে বিজয়ের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। ওদিকে বিজয় আবার কী করল, কোথায় গেল সেটার লোভও ছাড়তে পারছি না।

অতঃপর রাত্রি আট'টা বাজলে আমি ডাক্তার সেনশর্মার রিপোর্ট হাতে বিজয়ের বাড়ি গেলাম। কড়া নাড়তেই বিজয় একগাল হাসি নিয়ে দরজা খুলে দিল, বলল 'আয় তোর কথাই ভাবছি। তোরই ওয়েট করছিলাম। সোজা আমার ঘরে যা। আমি আসছি।' আমি কোনও প্রশ্ন করলাম না। সোজা ওর তিনতলার ঘরে চুপচাপ বসে রইলাম। ওর পড়ার টেবিলে একটা জেরক্স সেট রাখা, বুঝলাম এটা ত্রিপাঠি মেডিক্যাল কলেজের স্টুডেন্টস লিস্ট, ১৯৯৮। কিছু কিছু জায়গায় দেখলাম পেন দিয়ে দাগ করা আর তার ঠিকানাগুলো একটা বিশেষ ব্যাসার্ধ অনুযায়ী রয়েছে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে। উল্টেপাল্টে লিস্টটা দেখছি, ওমনি চকিতে বিজয় ঘরে ঢুকে বলল-

'সারাদিন কী কী করলি বল।'

ওকে যথাযথভাবে আমার কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে ডঃ সেনশর্মার রিপোর্টটা এগিয়ে দিলাম। বললাম 'সাত নম্বর প্যারা(অনুচ্ছেদ) টা দেখ।'

দেখলাম ওর চোখ সেই একই যায়গায় স্থির। কিন্তু কোনও চঞ্চলতা নেই। বুঝতে পারছিলাম মনে মনে সেও নিশ্চয়ই কিছু ধরতে পেরেছে। তারপর ও খানিক বাদেই লাফ মেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে বসল, উঠে বলল 'তুই একটা গাধা।'

'মানে?'

'আট নম্বর অনুচ্ছেদটা দেখ।'

আমি ওর হাত থেকে রিপোর্টটা নিয়ে বেশ কয়েকবার আট নম্বর প্যারাটা পড়ে বুঝলাম কী ভুলটাই না করেছি, এতক্ষণ অন্য একটা সূত্রে মাথা খারাপ করছিলাম, আর এটাও তো খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। আমি বললাম 'তার মানে তো...'

'শালা পুরো মেরে এনেছি। এবার আর পালাবি কোথায়!' জয়ের হাসি হেসে বলল বিজয়।

'মানে? কে?'

'বলছি। তার আগে ধূর্জটিবাবুর ফোনটা আসতে দে। মোটিভটা পুরো ক্লিয়ার নয়।'

'তাহলে কি নিজের ছেলেই...'

কথা শেষ হল না, তার আগেই বিজয় বলে উঠল 'এতক্ষণ দুর্যোধন আর ধৃতরাষ্ট্রের দিকে পড়েছিলাম, কিন্তু জয়দ্রথ আর কর্ণ মিস হয়ে গেছিল।'

'কী বলছিস এসব?' এগুলো তো সব মহাভারতের চরিত্র।'

'প্রমথেশবাবু তো শেষ জীবনে এই মহাভারতের কথাই বলতেন।'

'তা ঠিক।'

'কিন্তু তুই কী করলি?ওই জেরক্সে কিছু পেলি?'

'পেয়েছি।'

'কী?'

'বিজয়ধনুশ।'

'আবার?'

বিজয়ধনুশ কী?'

'জানি না। মনে নেই।'

'কর্ণের ধনুক। পরশুরামের দেওয়া।'

'তাতে কী?'

'তাতে এই যে নিজেরই বিজয়ধনুশে নিজেই মরল পরশুরাম।'

হঠাৎ আমাদের কথাবার্তার মাঝেই বিজয়ের মোবাইল বেজে উঠল। যা বুঝলাম ধূর্জটিবাবুর ফোন। বিজয় ফোনটা রিসিভ করে জানলার কাছে চলে গেল। ফোনের এপার থেকে যা কথা হল খানিকটা এরকম- 'হ্যাঁ বলুন। কী বলছেন? ওটার কপি আছে তো? ওহ হ্যাঁ। লিস্টটা আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এক কাজ করুন কাল সকাল দশটায় দত্তবাড়িতে একটা জমায়েতের ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ পেরেছি। আচ্ছা একটা ঠিকানা দিচ্ছি লিখুন...' বলে বিজয় একটা ঠিকানা দিয়ে বলল 'কাল সকালে বা আজ রাতেই একবার রেইড করুন। বহু ইনক্রিমিনেটিং এভিডেন্ট পাবেন

আশা করি। আর এই নম্বরে গত দু-তিন মাসে জীবনলালের কল ডিটেইলসটা বের করে রাখবেন তো। না ওকে আনার দরকার নেই।' বলে একটা মোবাইল নম্বর দিয়ে বিজয় ফোনটা ছাড়ল।

বিজয়ের চোখ-মুখ আমূল পাল্টে গেছে দেখলাম। ফোনটা রাখার পর থেকেই লক্ষ্য করছি, একটা অদ্‌ভুত উত্তেজনায় ফুটছে বিজয়। মনে হচ্ছে যেন বিজয় এই কেসের সুরাহা করে ফেলেছে। আমার নিজেরও খুব উত্তেজনা হচ্ছিল, বিজয়ের সাথে আমিও তো এই কেসে অনেক দৌড়েছি। নিজের উত্তেজনা চাপতে না পেরে বিজয়কে প্রশ্ন করলাম

'বল না ভাই কে?'

'তিনটে প্রশ্ন আছে, যদি উত্তর করতে পারিস, তাহলে নিজেই বুঝে যাবি।'

'আচ্ছা বল।'

'কুন্তির সন্তানলাভ, পরশুরামের ভুল আর বিজয় ধনুশ।'

'ধুর মাথায় কিছু ঢুকছে না। ইয়ার্কি মারিস না। বল ভাই।'

'বললাম তো আগে এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর খোঁজ। তাহলেই ধরতে পারবি।'

অনেক ভেবেও যখন কোনও উত্তর বলতে পারলাম না, তখন বিজয় বলল 'কাল সকাল ন'টায় পাড়ার মোড়ে চলে আসিস। দশটায় দত্তবাড়িতে রহস্য উন্মোচন।'

অগত্যা উদাস মনে বাড়ি ফিরলাম। সারাটা রাত অবশ্য একটা চাপা উত্তেজনায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না, বারবার বিজয়ের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছিলাম, কিন্তু পাচ্ছিলাম না। কখন যে ওই করতে ঘুমিয়ে পড়েছি মনেও নেই।

সকাল দশটা। দত্তবাড়ির বৈঠকখানা। গোল করে বসে দত্তবাড়ির সমস্ত সদস্য। বিজয় উঠে গিয়ে ঠিক ঢোকার দরজার মুখে ধূর্জটিবাবুর সাথে গোপনে কিছু কথা সেরে নিজের বক্তব্য পেশ করতে শুরু করল। বলা আবশ্যিক যে এই বৈঠকখানায় অমরেশ দত্ত, মিঃ রায়, প্রমথেশ দত্তের সলিসিটর এবং ডঃ সেনশর্মাও ছিলেন।

-'প্রমথেশ দত্ত খুন হন গত সোমবার, আর আজ রবিবার, অর্থাৎ সাতদিনের মধ্যেই আমরা কেসটা সুরাহা করতে পেরেছি, হয়তো অনেক আগেই করতে পারতাম কিন্তু মিঃ রায় কলকাতায় না থাকায় আমাদের সেটা করতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

'বিজয়বাবু আপনি জানতে পেরেছেন?' বললেন শ্রীপর্ণাদেবী।

'উত্তেজিত হবেন না শ্রীপর্ণাদেবী। বসুন বলছি।'

বলে বিজয় একটা সিগারেট ধরিয়ে বলা শুরু করল 'গত সোমবার কেউ বা কারা প্রমথেশবাবুকে তাঁর নিজের ঘরে গলা কেটে খুন করে, কিন্তু আততায়ীর সাথে কোনও ধ্বস্তাধস্তির প্রমাণ নেই। ঘর থেকে কোনও জিনিসও চুরি যায়নি, না বলপূর্বক বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকার কোনও প্রমাণ মিলেছে। অর্থাৎ আততায়ী এ বাড়িরই সদস্য।'

'কে আমার বাবাকে মারল বিজয়বাবু?' বললেন শতরূপ দত্ত।

'আপনি জানেন না? আপনার তো জানা উচিত।'

'মানে আপনি কী উল্টোপালটা বকছেন?'

'জীবনলালের সাথে ডিল, চারু মার্কেটের আদি দোকান বেচতে চাওয়া, বাজারে ষাট-সত্তর লাখ টাকার দেনা, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে 'রিজেন্ট-ক্লাব'এ জীবনলালের সাথে আপনার তর্কাতর্কি। আরও অনেক কিছু আছে। বলব?'

এই প্রথম শতরূপবাবুকে দমে যাওয়া মানুষ লাগছিল। জামার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে রাখলেন ঠিকই, কিন্তু জ্বালাতে পারলেন না, তাঁর হাত কাঁপছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। 'আপনি এসব?'

'তাই চুপচাপ বসুন। যখন আপনাকে বলতে বলা হবে, তখন বলবেন।'

'কিন্তু আ-আমি খুন করিনি।'

'করেননি ঠিকই, করাতে তো পারেন। যাক কয়েকটা জিনিস একটু ঝালিয়ে নেব, প্রমথেশবাবু নিজের ঘরের দরজা কখনও বন্ধ করতেন না, সেটা ভেজানো থাকত, দ্বিতীয়ত, উনি গরম খুব একটা সহ্য করতে পারতেন না এবং তৃতীয়ত, উনি কোনও রকম গন্ধ, তা সে মশার ধূপ-ই হোক বা আতর-পারফিউম, সহ্য করতে পারতেন না। এ কথা আমরা দত্তবাড়ির সদস্য আর রতনের কাছ থেকে জানতে পারি। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রমথেশবাবুকে যে বা যারা খুন করেছে, তাঁরা এ কথাটা খুব ভালোভাবে জানত এবং সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল।'

'মানে?'

'মানে এই যে কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই প্রমথেশবাবু মৃত্যুবরণ করেছেন, সেটা একজন সুস্থ মানুষ করতে পারে না, কোনও সুস্থ-সবল মানুষ প্রতিরোধ করবেই, তাঁকে সজ্ঞানে মারাটা কঠিন কাজ, তাই প্রতিরোধের সম্ভাবনাকে শূন্য করতে খুনির এই উদ্যোগ। এক্ষেত্রে খুনি তার কারিগরি বিদ্যার সফল প্রয়োগ করেও এ বাড়ির সদস্য হওয়ায় সহজে এ ঘরে কোনও এক সময় ঢুকে এই ছোট্ট ফাইলটি --'

বিজয় এবার সামনের টেবিলে রাখা একটা ছোট্ট ফাইবারের ফাইল সবার সামনে তুলে ধরল, দেখতে খানিকটা মশা মারার লিক্যুইডের মতো হলেও আকারে ছোট ও রংহীন।

বিজয় না থেমে একটানা বলে যায়- 'প্রমথেশবাবুর এসি-তে অর্থাৎ এসি-র কন্ডেনসারে জুড়ে দেয়।'

'কী আছে এতে?' প্রশ্ন করলেন শ্রীপর্ণাদেবী।

'ক্লোরোফর্ম। চেতনানাশক। এটা দিয়ে আততায়ী সমস্ত ঘরে, প্রকারান্তরে প্রমথেশবাবুকে অজ্ঞান করার প্রচেষ্টা করে, খুনি জানত, প্রমথেশবাবু কোনও না কোনও সময়ে এসিটা চালাবেনই। আর চালানোর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কন্ডেন্সরের ক্লোরোফর্ম নিজের কাজ করা শুরু করবে, কিন্তু সবসময় সে কাজ করাটাও রিস্ক, ঘরে অন্যান্য লোক থাকতে পারে। তাই খুনি

সব ভেবে রাতের সময়টা বাছে। যাতে অন্য কারুর ক্ষতির কোনও আশোঙ্কা না থাকে। সবকিছু ঠিকই যাচ্ছিল, কিন্তু বাধ সাধল একটা মাকড়সা। সেদিন সে এ ঘরে ঢুকে পড়ে আর এসিটা চালানোর পর সেও আস্তে আস্তে চেতনাহীন হয়ে পড়ে ও দীর্ঘক্ষণ ওই অবস্থার দরুণ অসহায় মৃত্যু বরণ করে। এক্ষেত্রে ওই মাকড়সা বা প্রমথেশবাবুর দেহে কোনও চেতনানাশকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কারণ তারা সেটা স্বেচ্ছায় নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছিলেন।'

'কিন্তু এত কিছু করল কে?'

'দাঁড়ান শ্রীপর্ণাদেবী। আমি সবেমাত্র শুরু করেছি। অমরেশ যে রাত্রে এসেছিল ও এই ঘরে প্রমথেশবাবুর সাথে এক বিস্তর বাকবিতণ্ডা হয়। একথা আমরা জেনেছি খোদ অমরেশ ও পার্থবাবুর কাছ থেকে। তুমি খুব ভাগ্যবান অমরেশ যে ক্লোরোফর্মের ফাইলটা তোমার যাওয়ার পর কাজ শুরু করেছিল। না হলে তোমার অবস্থাও অন্যরকম হতে পারত। এবার আমি পরের ঘটনাক্রমে আসব। অমরেশ এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর হত্যাকারী; এখানে বলে রাখা ভালো হত্যাকারীকে হত্যার ধরণ দেখে পুরুষ বলেই মনে হয়; ভাবলেন যে এই, মোক্ষম সুযোগ প্রমথেশবাবুকে খুনটা করে দোষটা অমরেশের গায়ে চাপিয়ে নিজে নির্দোষ সাজা। তিনি একটি ও.টি. মাস্ক ও গ্লাভস পরলেন এবং অত্যন্ত সুনিপুণ হাতে ঘরের ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা প্রমথেশবাবুর ভোকাল কর্ডটা কেটে দিলেন। প্রমথেশবাবু আগেই ক্লোরোফর্মে আচ্ছন্ন ছিলেন, তাই কোনও প্রতিরোধ করতে পারলেন না, খুনি খুন করার পর এসি বন্ধ করে ঘরের জানলা দুটো খুলে এসি-র কন্ডেনসর থেকে ক্লোরোফর্মের ফাইলটা বের করে চুপচাপ নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। ঠিক ভোর হওয়ার মুখে তিনি আবার ও ঘরে গেলেন, এসিটা চালিয়ে দিলেন কারণ ততক্ষণে ক্লোরোফর্মমুক্ত বাতাস বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে এবং জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু সমস্যাটা হল একটা জানলা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, সেটা পরে খুলে গেছিল, অনেকদিন ধরে জানলা খোলা পরা না করার দরুণ ছিটকিনিটা জ্যাম হয়ে গেছিল ও সেটা আততায়ী জানত না। ফরেনসিক টিমের বক্তব্য ছিল খুনের ধরণ দেখে খুনিকে ডাক্তারিবিদ্যা বা কসাই ব্যবসার সাথে জড়িত বলে মনে হয়, সারা মানবদেহের প্রতিটা শিরা, উপশিরা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।এক্ষেত্রে খুনি তার প্রখর ডাক্তারিবিদ্যার পরিচয় এ খুনে রেখেছেন।'

'তাহলে কি আমার ছেলে?' ডুকরে কেঁদে ওঠেন সীমাদেবী।

'আমি আসছি। এখনও আমি পুরোটা বলিনি। তো যেটাই বলছিলাম, আমার ব্যক্তিগত অনুধাবন ছিল যে খুনি ডাক্তারিবিদ্যা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি কৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই আমি এ বাড়ির সমস্ত সদস্যর কাছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে চেয়েছিলাম প্রথম দিন। সবাই ঠিকঠাক উত্তর দিলেও একজন আছেন, যিনি সেদিন পুরো সত্যিটা বলেননি। আমি আশা করব আজ তিনি বাকি সত্যিটা বলবেন। পার্থবাবু-'

পুরো ঘরে যেন একটা স্তব্ধতা নেমে এল, যখন বিজর পার্থবাবুর দিকে প্রশ্নবাণটা ঘুরিয়ে দিল। পার্থবাবু ভাবলেশহীন অবস্থায় বললেন 'বলুন।'

'বাকি সত্যিটা?'

'কোন সত্যিটা?'

'ত্রিপাঠি মেডিক্যাল কলেজ, ১৯৯৮।'

'হ্যাঁ তো?'

'না এটা তো সেদিন বলেননি'

'বলার প্রয়োজন মনে করিনি। আই ওয়াজ আ ড্রপ আউট।'

'কেন?'

'টাকা ছিল না সেমিস্টার শেষ করার।'

'তাই কী?'

আর নয় তো কী?'

'রিপোর্টে তো অন্যরকম কিছু লেখা আছে পার্থবাবু। আপনি কলেজে পড়াকালীন বদ সঙ্গে মিশে গোল্লায় যান। নিত্যদিন মদ কোকেন নারীসঙ্গ। আপনাকে ক্যাম্পাসে কোকেনসহ হাতেনাতে ধরায় আপনাকে বহিষ্কার করা হয়। এই যে আপনার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট কাম এক্সপেল অর্ডার।'

'তাতে খুনের কি সম্পর্ক?' পার্থবাবু কিছুটা দমলেন মনে হল।

'তারপর আপনি লোকলজ্জার ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসে আশুতোষ কলেজে জেনারেল এ ভর্তি হন। আপনার বাবা আপনার এই অধঃপতন মানতে না পেরে অকালে মারা যান। আপনি কলেজে শ্রীপর্ণাদেবীর ঘনিষ্ঠ হন। তাকে পালিয়ে বিয়ে করেন এবং বিয়ের পর যথারীতি পুরনো মেজাজে ফিরে পৈতৃক সব সম্পত্তি খুইয়ে এখানে এসে ওঠেন।'

'আমি বুঝতে পারছি না আপনি বলতেটা কী চাইছেন?'

'আপনার ছাত্রাবস্থায় আপনি ওখানকার এক মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার কিঞ্চিৎ কিছু সময়ের জন্য সে সম্পর্কে ছেদ পড়ে। ঘটনাচক্রে সেই মেয়েটিরও একটি বড়লোক বাড়িতে বিয়ে হয়ে যায়। আপনি এ বাড়িতে আসার পর আবার সেই পুরনো সম্পর্ক নতুন করে শুরু হয়। আপনি এবার বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হন। আপনাকে তার ঘরে ঢুকতে রতন কিন্তু বহুবার দেখেছে।'

'হঠাৎ ঘরে একটা স্ত্রীলোকের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। আমাদের সবার নজর যায় ঘরের এক কোণে বসে থাকা অঙ্কিতাদেবীর দিকে। তিনি শাড়ির আঁচল দুই হাতে চেপে কেঁদে চলেছেন।'

'কী অঙ্কিতা দেবী? পার্থবাবুই তো আপনার পুরনো সেই প্রেমিক?'

অঙ্কিতাদেবী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান। শতরূপবাবুকে কিঞ্চিত অসহজ লাগে। তিনি ঘরের গুমোট ভাবটা কাটিয়ে বলেন, 'বিজয় বাবু, এসব আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার।'

'একটা মানুষ খুন হয়েছে শতরূপ বাবু, আমায় তার মৃত্যু রহস্যের কিনারা করতেই হবে। আমি আসবো এবার এই মেডিকেল রিপোর্টে যেটা এই বাড়ির বহুদিনের ডাক্তার, পরিচিত ডাক্তার ডক্টর সেনশর্মার বানানো। এর বিশেষ একটা জায়গা আমি একটু পড়ে শোনাতে চাই। কোনও ভুল হলে ডক্টর সেনশর্মা একটু শুধরে দেবেন।'

ডক্টর সেনশর্মা নিজের ডিবে থেকে একটা পান মুখে পুরে সায় দিলে। বিজয় বলল, 'এই রিপোর্টে লেখা আছে যে শতরূপবাবু ও শ্রীপর্ণাদেবী সন্তান ধারণে অক্ষম অর্থাৎ they are incapable of having any issue' কি আমি ঠিক তো ডাক্তার?'

'রাইট।' বেশ পান চিবোতে চিবোতে বললেন ডক্টর সেন শর্মা।

বিজয় বলল, 'কি অদ্ভূত চিত্রনাট্য। দু-জোড়া দম্পতির এক একজন সন্তান ধারণে অক্ষম। শতরূপবাবু ও শ্রীপর্ণাদের জীবনসঙ্গীর এই দীর্ঘদিনের ব্যভিচার চুপচাপ মেনে নিয়েছিলেন, সম্পত্তি থেকে বেদখল ও পিতৃপরিচয় সামনে এলে সামাজিক মানহানির জন্য হয়তো শতরূপবাবু চুপ করে ছিলেন। আর শ্রীপর্ণাদেবী? স্রেফ ভালোবাসেন বলে থেকে গেলেন?'

শতরূপবাবু ও শ্রীপর্ণাদেবী চুপচাপ ও নিস্তবদ্ধতায় নিজেদের উত্তর ব্যক্ত করলেন।

'চিনে নিন নন্দনা, এই আপনার পিসেমশাই আপনার আসল বাবা। বায়োলজিক্যাল ফাদার।'পার্থবাবুর দিকে আঙুল তুলে বলল বিজয়। নন্দনাদেবী সব চুপচাপ শুনছিলেন এতক্ষণ, হঠাৎ তাকে উদ্দেশ্য করে তার আসল পিতৃপরিচয় প্রকাশ করায় নন্দনাদেবী যেন শোকবিহ্বল এক মহিলার মত পাথর হয়ে যান। অঙ্কিতাদেবী তার মাথায় হাত বোলাতে গেলে চকিতে ক্রোধান্বিত হয়ে নন্দনাদেবী বলেন, 'তুমি নোংরা, ছোঁবে না আমাকে। আই হেট ইউ।' অঙ্কিতাদেবী নন্দনার এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বেশ কিছুটা দমে গেলেন। তারপর বললেন, 'বিজয়বাবু এটা ঠিক যে ও পার্থর মেয়ে। কিন্তু ওকে শতরূপ নিজের মেয়ের মত মানুষ করেছে। কোনদিনও বুঝতে দেয়নি যে ও ওর বাবা নয়।'

নন্দনা হঠাৎ ঘর ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যান। কোনও কুমারী মেয়ের পক্ষে এই ধরনের সামাজিক হেনস্থা চূড়ান্ত অপমানসুলভ।

বিজয় এরপর বলে, 'শতরূপবাবু, আপনার বাবা এই সম্পর্কের কথা আর নন্দনাদেবীর আসল পরিচয় জানতে পেরে যান। তাই তো? '

শতরূপবাবু চোখ মুছে বলেন, 'হ্যাঁ।' কান ভাঙানোর লোকের তো অভাব নেই। বাবা কোথাও থেকে এই কথা জানতে পেরে আমাকে ডেকে পাঠান। আমাদের মধ্যে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়। বাবা রেগে গিয়ে আমাদের সম্পত্তি থেকে বেদখল করার কথা বলেন। সেদিন জীবনলালের সামনে রিয়্যাক্ট করেন।'

'পার্থবাবু আপনি চেনেন তো?'

'কাকে?'

'যাকে দলিলটা বেচব বলে ভেবেছিলেন।'

'কে? কার কথা বলছেন? আমি কোনও দলিলের ব্যাপারে জানি না।'

'আপনি জীবনলালকে চেনেন না?'

'হ্যাঁ এ বাড়িতে আসতে দেখেছি। কথা বলিনি কোনোদিন।'

'কি মুশকিল! জীবনলালের কল ডিটেইলস রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। আপনার শশুরের মৃত্যুর আগের দিন থেকে আজ অবধি জীবনলালেরজীবনলালের গড়ে সাতবার করে আপনার নাম্বার থেকে ফোন গেছে। আপনিই তো গত রবিবার 'রিজেন্ট ক্লাব'-এ গিয়ে জীবনলালের সাথে মিটিং করে এসেছেন, ওয়েটারকে দু'হাজার টাকা টিপস দিয়ে।'

'আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন। খালি বোকা সাজার ভান করছেন। আচ্ছা আপনার বাড়িটা কোথায়?'

'কতবার বলব? ' বাবু গর্জে ওঠেন।

'আরেকবার বলুন না।'

'বরাহনগর।'

'শেষ কবে গেছেন?'

'মনে নেই।'

'কী আশ্চর্য! মনে নেই? অথচ ওখানে বসবাসকারী আপনার নিজের কাকা যে বললেন আপনি প্রতি সপ্তাহে একবার ও বাড়ি যান, আপনার নামে ইলেকট্রিকের বিল আসে প্রতি মাসে, যেটা আপনি জমা করেন। আমাদের কাছে কিন্তু সব রেকর্ড আছে'

'হ্যাঁ করি। তাতে করে কী প্রমাণ হয়?'

'তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে আপনি আপনার শ্বশুরকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে ভোকাল কর্ড কেটে খুন করেন।'

'তাহলে আমি বলব আপনি একটি বদ্ধ উন্মাদ। কারণ মোটিভ ছাড়া খুন করার বোকামিটা অন্তত আমি করব না।'

'আর আমি যদি বলি মোটিভ ছিল।'

'কী মোটিভ?'

'প্রমথেশবাবু আপনাকে সম্পত্তি থেকে বেদখল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এটা জেনে আপনি তাকে খুন করেন এবং জীবনলালের কথা জানতে পারার পর অতিরিক্ত অর্থ লাভের লোভ আপনাকে গ্রাস করে।'

'প্রমাণ করতে পারবেন? যেগুলো বললেন।'

'প্রমাণ? এই যে প্রমাণ। এবার বিজয় একটা দলিল ও একটা ব্যাগ সবার সামনে তুলে ধরল।' ব্যাগ খুলতে গেলে দেখা যায় সেখানে একটি সার্জিক্যাল কিট ওটি মাস্ক ও গ্লাভস রাখা। বিজয় বলতে শুরু করে, 'এই প্রমথেশবাবুর আসল ও শেষ দলি। যে দলিলে স্পষ্ট লেখা আছে যে তিনি আপনাকে, অঙ্কিতা দেবীকে ও নন্দনাদেবীকে নিজের সমস্ত সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার করলেন।'

পার্থবাবুর সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। তিনি তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখে একটা সিগারেট ধরান। বিজয় বলে চলে 'অন্য একটা দলিল উঁচিয়ে 'আর এই যে চারু মার্কেটের দোকানের দলিল। যেটা প্রমথেশবাবু কখনও কাউকে দেননি। এবার প্রমথেশ বাবুর সলিসিটর মিঃ রায় একটু বলবেন। মিঃ রায় প্লিজ।' এবার প্রমথেশবাবুর সলিসিটর মিঃ রায় বলেন, 'দুটো দলিল যা বিজয়বাবু দেখালেন, তা ইনভ্যালিড। কারণ প্রথম দলিলের অরিজিনাল কপি আমার কাছে আছে স্ট্যাম্প পেপার সমেত, যে স্ট্যাম্প পেপার বিজয়বাবুর দলিলে নেই আর দ্বিতীয় দলিলটা অর্থাৎ চারু মার্কেটের দোকানের দলিলেরও একটাই কপি যেটা আমার কাছে আছে। এর অন্য কোন কপি নেই। যা বিজয়বাবু দেখালেন তা ব্ল্যাঙ্ক দলিল। ওখানে প্রমথেশবাবুর সই আছে ঠিকই কিন্তু কোনো সাক্ষীর সই নেই। কাজেই ও দলিল গ্র্যান্ট হবে না', বলে সলিসিটর মিঃ রায় বসে পড়লেন।

এরপর বিজয় বলে চলে, 'পার্থবাবু আপনি সবকিছু ঠিকই করেছিলেন, কিন্তু আপনার দোকানে রাখা ত্রিপাঠি মেডিকেল কলেজের পিকনিকের গ্রুপ ফটোটা সব গোলমাল করে দি। আমি তখনই জানতাম খুনটা আপনি করেছেন। শুধু প্রমাণ জোগাড়ের অপেক্ষা করছিলাম। আপনি ছকটা অসাধারণ সাজিয়েছিলেন, ঘরের সামনের বাতি নিভিয়ে প্রকারান্তরে আপনার দীর্ঘদিনের ইলেকট্রনিক্স দোকানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, এসির কন্ডেনসরের মধ্যে ক্লোরোফর্মের ফাইল ঢুকিয়েপ্রমথেশবাবুকে অজ্ঞান করে, দলিল দুটো সরিয়ে, ডাক্তারি বিদ্যার সঠিক প্রয়োগ করে তাকে খুন করেন। কিন্তু সব মাটি হয়ে গেল পার্থবাবু। যে সম্পত্তির জন্য আপনি এত কিছু করলেন সেই সম্পত্তি এখন আর আপনি ভোগ করতে পারবেন না। এই ব্যাগটা আর এই দুটো দলিলই কিন্তু পুলিশ আজ আপনার বরাহনগরের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করে। সো, জেলে আপনাকে যেতেই হচ্ছে।'

পার্থবাবু তার সিগারেটের থেকে অনেকটা ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলে বলেন, 'আমার আর অন্য কোন উপায় ছিল না বিজয় বাবু। আমি দেনায় দেনায় জর্জরিত হয়ে গেছিলাম। এরপর বাবা যদি আমাকে তার সম্পত্তি থেকে বেদখল করতেন আমার আর কোনো রাস্তা থাকত না।'

'আপনার মুশকিলটা কি জানেন? আপনি সারাটা জীবন শুধু নিজের কথাই ভেবে গেলেন। যে মানুষটা বৈভব ছেড়ে আপনার সাথে থেকে গেল তার কথা এক দিনও ভাবলেন না। সে কিন্তু আপনার আর অঙ্কিতাদেবীর অবৈধ প্রেমের কথা জেনেও আপনাকে ছাড়েননি।'

'তুমি সব জানতে?' শ্রীপর্ণাদেবীকে প্রশ্ন করেন পার্থবাবু।

'জানতাম।' কাঁদতে কাঁদতে বলেন শ্রীপর্ণাদেবী।

'কিছু মনে করবেন না শ্রীপর্ণাদেবী। আপনি যে সন্তান ধারণে অক্ষম সেটা পার্থবাবু জানতেন না। আমরাও জানতাম না।কিন্তু ডক্টর সেন শর্মার রিপোর্টে বিয়ের আগে আপনার ইউটেরাস

অপারেশনের কথা জানতে পারি। আপনি বোধহয় এই কথা পার্থবাবুকে বলেননি। আর উনি ভাবলেন যে আপনি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম।'

এরপর শ্রীপর্ণাদেবী পার্থবাবুকে বুকেজড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। বিজয় ধূর্জটিবাবুকে ইশারা করতে এক কনস্টেবল পার্থবাবুকে শ্রীপর্ণাদেবীর আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে হাতকড়া পড়াতে উদ্যোগী হলে, পার্থবাবু চোখ মুছে শ্রীপর্ণাদেবীকে বলেন, 'তোমার সাথে অনেক খারাপ করেছি। পারলে ক্ষমা করে দিও।'

কনস্টেবল পার্থবাবুকে হাতকড়া পড়িয়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলে পর, সারা ঘটায় যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। আমরাও কথা না বাড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি। সত্যি কথা বলতে কী ওরকম পারিবারিক শোকের সময় ওখানে থাকতে মন করছিল না। আমরা বেরিয়ে আসতে ধূর্জটিবাবু বললেন, ' আপনি কি করে বুঝলেন মশাই পার্থবাবু খুনি?'

'কাল ফেরত আসার সময় একবার রিজেন্ট ক্লাবে গিয়েছিলাম। গিয়ে সেই ওয়েটারটাকে পার্থবাবুর ছবি দেখাতে কনফার্ম করল, ব্যাস সন্দেহ, মোটিভ সব একাকার।'

'তাহলে ওই তিনটে প্রশ্ন যেটা তুই কাল রাতে আমায় করলি?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'জয়দ্রথ ছিল কৌরবের জামাই। এক্ষেত্রে প্রমথেশবাবুর জামাই মানে পার্থবাবু, পরশুরামের ভুল অর্থাৎ প্রমথেশবাবুর সমস্ত সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করা আর কুন্তীর সন্তানলাভ?'

'অঙ্কিতাদেবীর সন্তানলাভ।' আমি বললাম।

'ফাটিয়ে দিয়েছিস তো।'

আমি একটু কেতা নিয়ে কিছু বলতে যাব ঠিক তখনই বিজয় আবার বলে উঠল, 'তবে এ ক্ষেত্রে জয়দ্রথের বিজয়ধনুশটা বেকার গেল।'

ঠিকই তো, বিজয় তার বুদ্ধিমত্তা আর প্রখর মনস্তত্ত্বের সাহায্যে যেভাবে এই কেসটা সলভ করল তাতে এই কেসটা নামই তো হওয়া উচিত 'বিজয়ধনুশ।' বিজয় যেন এযুগের কর্ণ। সাদা উর্দি না পরেও নিজের কর্তব্য ও দায়িত্বে অবিচল থেকে অভীষ্ট লক্ষ্য ভেদ করে ফেলল।

***

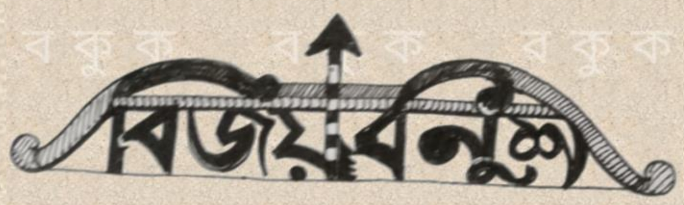

চিত্র শিল্পীঃ **পারমিতা দত্ত**

বই কুটির
কলকাতা

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন

+91- 9903129991

boikutirkolkata@gmail.com

https://www.facebook.com/Boi-kutir-kolkata-বই-কুটির-কলকাতা-123508622632570/

https://www.boikutirkolkata.co.in

https://www.instagram.com/Boi_Kutir_Kolkata/